এপ্রিল-জুন ২০২৩

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৫তম সংখ্যা

স্থানীয় সরকার ও নগর উন্নয়নবিষয়ক সাংবাদিকতা

নিরীক্ষা

২৪৫তম সংখ্যা: এপ্রিল-জুন ২০২৩

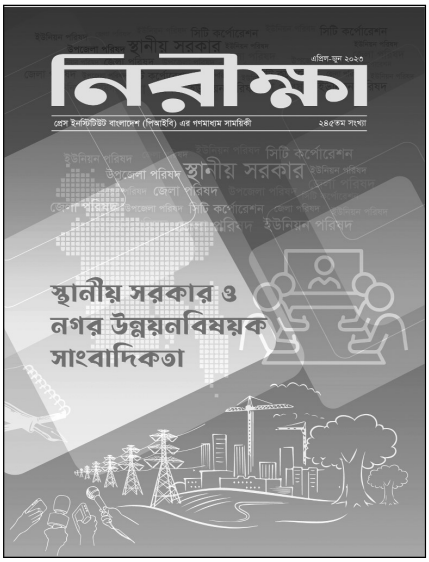

সুশাসন নিশ্চিতের পাশাপাশি নাগরিক সেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার ও নগর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাবনায়ও এই লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ সাংবাদিকতা জরুরি।

স্থানীয় সরকার হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিষদ। যারা ওই এলাকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কল্যাণকর কাজ করতে বদ্ধপরিকর। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসকারী গণমানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কল্যাণ, যা কিছু মঙ্গল তা নিশ্চিত করার কাজটি করে স্থানীয় সরকার। এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ, এর সবটাই সুচারুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাদের। স্থানীয় সরকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন। আছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিশেষ কিছু আঞ্চলিক স্থানীয় সরকারব্যবস্থাও।

স্থানীয় সরকারের কাজ মূলত অবকাঠামোসহ উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা, পরিবেশ, বাজেটসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসাবাণিজ্য প্রসারে ভূমিকা, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় বাজার, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, জন-উদ্যোগ, পরিবহণব্যবস্থা, এনজিও কার্যক্রম ও স্থানীয় নির্বাচন। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি-সেচ-পরিবেশ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও যুব উন্নয়ন এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে। এই কাজগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করতে এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত রাখতে সহায়ক শক্তি হতে পারেন গণমাধ্যমকর্মীরা। এ ক্ষেত্রে সংবাদ তৈরি, সরেজমিন প্রতিবেদন, কলাম লিখে গণমাধ্যমে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের মাধ্যমে সহায়ক হিসাবে কাজ করেন গণমাধ্যমকর্মী। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ ধরনের সংবাদের ব্যাপকতা দেখা যাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে জবাবদিহির জায়গাটি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

একসময় সাংবাদিকতায় সম্পৃক্তজনের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। ঢাকার বাইরের জেলা শহরে খুব কমসংখ্যক সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা বা অন্য গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ছিল। অনেক জেলা থেকে সংবাদ আসতে কখনো কখনো ৩-৪ দিন লেগে যেত। কিন্তু আজ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার অনেকদূর এগিয়েছে। এখন তৃণমূলের শেষ প্রান্তেও সাংবাদিকদের পদচারণা। এমন কোনো উপজেলা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে সংবাদকর্মীরা খবর খোঁজায় ব্যস্ত থাকেন না। তারপরও বাস্তবতা হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিক অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রশিক্ষিত এবং দক্ষ নন। বিশেষ করে স্থানীয় সরকারবিষয়ক সাংবাদিকতায়। তাঁরা ইনডেপথ রিপোর্টিং সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। সংবাদ লেখা ও সম্পাদনার বিষয়েও তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের সেই প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেকেই বিষয়গুলো গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারেন না। যদিও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) সারা দেশে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে, যার অন্যতম একটি সেশন হচ্ছে স্থানীয় সরকারবিষয়ক সাংবাদিকতা। ঢাকায় যাঁরা স্থানীয় সরকার বিট করেন, তাঁদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পিআইবি। সম্প্রতি স্থানীয় সরকারবিষয়ক পিআইবি-ইএএলজি মিডিয়া ফেলোশিপ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর তত্ত্বাবধানে। অবশ্য বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। তবে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা পর্যাপ্ত নয়। এ ক্ষেত্রে আরও প্রশিক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

নিরীক্ষার বর্তমান সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে স্থানীয় সরকার ও নগর উন্নয়নবিষয়ক সাংবাদিকতা দিয়ে। সংখ্যাটিতে প্রবীণ রাজনীতিক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য হায়দার আকবর খান রনোর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার স্থান পেয়েছে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি সাংবাদিক, গবেষক ও পাঠকের আগ্রহের খোরাক জোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

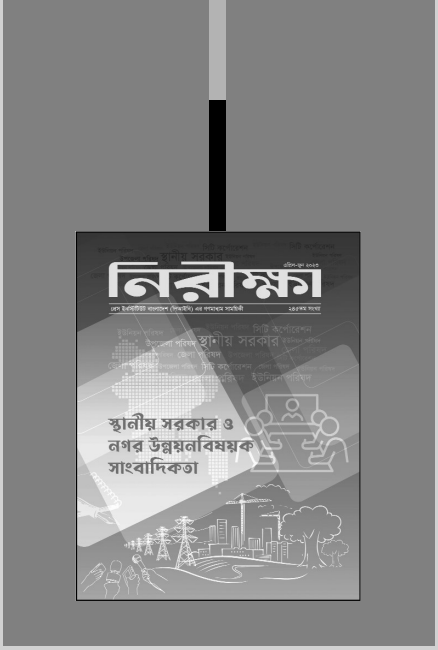

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনবিষয়ক সাংবাদিকতা ৩
তোফায়েল আহমেদ

স্থানীয় সরকারের সবকিছু কেন্দ্রীভূত করে সমস্যাগুলোকে জটিল করে চলেছি ৬
আবু আলম মো. শহিদ খান

স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা: সমস্যা ও সম্ভাবনা ৮
সিকান্দার ফয়েজ

স্মার্ট বাংলাদেশে স্থানীয় অর্থনীতি এবং স্থানীয় সরকার ১২
নিরঞ্জন রায়

শহর উন্নয়ন, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা ১৬
আবুজার

স্থানীয় সরকার ও মফস্সল সাংবাদিকতা ২১
মামুন অর রশিদ

নগর ও নগরসেবা সংক্রান্ত সাংবাদিকতার শুরুর কথা ২৪
মিনহাজ উদ্দীন

২৬ গ্রাম আদালত স্থানীয়দের জন্য ন্যায়বিচারের সহজ প্রবেশাধিকার
দীপক কুমার আচার্য

২৮ সূত্র থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে বড়ো খবর
রাজন ভট্টাচার্য

৩১ ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেখ মুজিবের মতো এমন সম্মান আর কেউ অর্জন করেননি –হায়দার আকবর খান রনো
বনশ্রী ডলি

৩৯ সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্য উপেক্ষিত
শিবুকান্তি দাশ

৪৪ মৃত্যুঞ্জয়ী সাংবাদিক জুলিয়াস ফুসিক ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান
আহ্সান উল্লাহ্

৪৯ গণমাধ্যম সংবাদ

৫৭ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনবিষয়ক সাংবাদিকতা

তোফায়েল আহমেদ

সংবাদমাধ্যম বা গণমাধ্যমের বহুমুখিতা ও বিস্তৃতির নানা দিক রয়েছে। একসময় শুধু মুদ্রিত সংবাদপত্রই ছিল বিশ্বব্যাপী একমাত্র সংবাদমাধ্যম। কয়েকদিনের পুরোনো সংবাদ একসঙ্গে পেয়েও মানুষ তা গোগ্রাসে গিলত। সংবাদপত্রের সে যুগে পাঠকের স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র বাছাই করার সুযোগ ছিল না। কারণ, সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম, যা ছিল তার পরিসরও ছিল সীমিত এবং অনুন্নত প্রযুক্তিও ছিল সংবাদপত্রের সহজ বিকাশের একটি অন্যতম বড়ো প্রতিবন্ধক। তাই সেসময় যা-ই পাওয়া যেত, তা-ই পাঠক সাদরে গ্রহণ করত। একবিংশ শতাব্দীর আমাদের এ সময় সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহের একটি মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছে। মুদ্রণ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে মুদ্রণ ব্যয় সাশ্রয়ী, সময় সাশ্রয়ী, সহজ ও অনেক আকর্ষণীয় হয়েছে। মুদ্রিত সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনলাইন সংবাদপত্র। উন্নত বিকল্প হিসাবে রয়েছে রেডিয়ো, টিভি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রভৃতি। এখন আর সংবাদপত্রের খবরের জন্য ১২/২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না। প্রতিমুহূর্তে এখন সংবাদ আপডেট পাওয়া যায়। সংবাদে আগ্রহী একজন ব্যক্তির এখন একাধিক মাধ্যম থেকে সংবাদ গ্রহণ ও যাচাই করার সুযোগ থাকে। তাছাড়া সংবাদমাধ্যম থেকে সংবাদ গ্রাহকের চাহিদায়ও ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এসেছে। রাজনীতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিনোদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ ও বাণিজ্য, শেয়ার ও বিভিন্ন পণ্যের বাজার এবং

উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের আবার স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ডাইমেনশন যুক্ত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যম শুধু নিরেট ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করে ক্ষান্ত হয় না–সংবাদ সৃষ্টি করে, সংবাদের পেছনের সংবাদ পরিবেশন করে। সংবাদের বিশ্লেষণ করে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রকে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। রাষ্ট্রীয় নানা নীতি-কাঠামোর সমালোচনাপূর্বক বৃদ্ধি করে নাগরিক সচেতনতা, এভাবে গণমাধ্যম তথা 'সংবাদ শিল্প' (শিল্প দুই অর্থে আর্ট এবং ইনডাস্ট্রি) একজন আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক রকমের চাহিদা পূরণ করে। গণমাধ্যম এখন আধুনিক মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। নিত্যদিনের অতিপ্রয়োজনীয় একটি জীবনোপকরণ।

একজন আধুনিক মানুষ তার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-জীবনের সুষ্ঠু-সুস্থ পরিচালনা ও নির্বাহের জন্য রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে তার কিছু স্বাধীনতা ও অধিকার সমর্পণ করে কিছু কিছু বিষয়ে সহায়তা ও সুরক্ষা চেয়েছে। এটি না হলে সভ্য সামাজিক মানুষের জীবনের বিকাশ স্বচ্ছন্দ হচ্ছিল না। সমাজে শান্তি, স্বস্তি ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল না। সমাজে মানুষের মধ্যে পরস্পরের শারীরিক বা পেশিশক্তি, আর্থিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পটভূমির ভিন্নতা সত্ত্বেও সমমর্যাদা, সম-অধিকার ও বাধাবিঘ্ন ছাড়া বসবাসের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান ভূমিকা ও দায়িত্ব অনস্বীকার্য। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যে পারস্পরিক অঙ্গীকার, এর যে কাঠামো, এর একটি অলিখিত উপায় ও উপাদান 'সামাজিক চুক্তি' এবং সামাজিক চুক্তির শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ 'সংবিধান'। সংবিধান রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি গুচ্ছ সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম, নিয়মনীতির নানা ছক বেঁধে দিয়েছে। রাষ্ট্রের শাসন ও প্রশাসন কাঠামোকে জাতীয় বা কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় নানা বিভাজনে বিভক্ত করে শাসন পদ্ধতির সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা দিয়েছে। যেমন একটি ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্র, প্রদেশ ও স্থানীয় তিন স্তরের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের নানা স্তরীভূত কাঠামো রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো এককেন্দ্রিক। তাই আমাদের এখানে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার নেই। আমাদের রয়েছে জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার। অর্থাৎ, দুই স্তরীয় সরকারব্যবস্থা।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের পরস্পরের মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসম্পাদনের একটি বন্দোবস্ত বিদ্যমান। সে বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে জাতীয় সরকারের সম্পূরক ও পরিপূরক হিসাবে দেশে স্থানীয় সরকার ও শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশের গণমাধ্যমজগৎ পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এদেশে গণমাধ্যমের আকার-আয়তন, বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি বিগত চার দশকে একটি অতি উচ্চস্থানে পৌঁছে গেছে। দেশে গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখার কর্মী তথা সাংবাদিক-সম্পাদক, লেখক, পাঠক, দর্শক এবং একটি বিকাশমান শিল্প হিসাবে এর মালিক-শ্রমিক, জোগানদার ও সরবরাহকারী মিলে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ এ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত। সে হিসাবে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন, স্থানীয় রাজনীতি, সমস্যা-সংকট, উন্নয়ন জনসমাজের বিপুল অংশের আগ্রহের একটি উর্বর ক্ষেত্র। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র জাতীয় ভাবমূর্তিকে ধারণ করলেও দৈনন্দিন যাপিত জীবনকে সরাসরি স্পর্শ করে স্থানীয় শাসন ও সেবা কাঠামো। তাই এ কাঠামোর সত্যিকারের কার্যকারিতার প্রয়োজনে এই স্তরের ভালো-মন্দ নিয়ে গণমাধ্যমের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনটা দুদিক থেকে। গণমাধ্যম নিজের উপযোগিতাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার প্রয়োজনেও স্থানীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় সমাজ নিয়ে বিশেষায়িত ইউনিট বা বিট সৃষ্টি করতে পারে। অপরদিকে ব্যাপক জনসচেতনতার প্রয়োজনেও স্থানীয় সরকার ও শাসন যা জনজীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে তাকে তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে পারে বা পারা উচিত। এসব উপলব্ধি থেকে আজকাল স্থানীয় সরকার ও শাসন বিষয়ে গণমাধ্যম অনেক বেশি আগ্রহী হয়েছে। মানুষের মধ্যে গণমাধ্যমে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সেবা ও স্থানীয় শাসনবিষয়ক তথ্যাদি জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের মধ্যে কিছু উৎসাহী তরুণ স্থানীয় সরকার, সেবা ও শাসন বিষয়ে বিশেষায়িত রিপোর্টিংও শুরু করেছে।

॥ তিন ॥

একসময় সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডি গবেষকদের একটি প্রিয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় সরকার বিষয়ে থিসিস রচনা। যতটা না অ্যাকাডেমিক গুরুত্ব, এর চেয়ে তাদের পলায়নি ও ফাঁকিবাজি মনোভাব এর পেছনে কাজ করেছে বেশি। তারা ধরে নিয়েছিল এখানে কাজে খরচ ও ঝুঁকি কম। সময় কম লাগে। তথ্য সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে সহজ। তাই দেখা যায়, স্থানীয় সরকারবিষয়ক প্রচুর থিসিস লেখা হয়েছে। বহু পিএইচডি ডিগ্রি হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সত্যিকারের অ্যাকাডেমিক মূল্য আছে, সেরকম উল্লেখযোগ্য গবেষণা খুব একটা হয়নি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বেশির ভাগ স্থানীয় সরকারবিষয়ক রিপোর্টে কোনো গভীরতা নেই। নেই সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। রয়েছে প্রয়োজনীয় তথ্য ঘাটতি বা তথ্যের সামঞ্জস্যহীনতা। একজন সংবাদকর্মী স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন বিষয়ে বিশেষায়িত বা বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে নিম্নের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ দরকার। সর্বপ্রথম যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব তা হচ্ছে, পেশার প্রতি ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বস্ততা। পেশাদারির সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশার দায়িত্ব নির্বাহে প্রতিশ্রুতিশীলতা না হলে সাংবাদিকতা হয় না। তাই সাংবাদিকতার বিশেষ নেশা না থাকলে পেশা হিসাবে এ কষ্টসাধ্য কাজের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক কম কষ্ট ও কম ঝুঁকিতে অন্য পেশায় এর চেয়ে ভালো আয়-রোজগার হতে পারে। তাই এখানে নেশা ও পেশার একটি আবেগঘন সম্পর্ক সৃষ্টি হলেই হয় সোনায় সোহাগা। দ্বিতীয় বিষয় হবে–পড়াশোনার অন্তহীন আগ্রহ ও অদম্য জ্ঞানপিপাসা। তৃতীয় বিষয় হবে–গভীর অনুসন্ধিৎসা ও অতৃপ্তি এবং খ্যাপার পরশ পাথর খোঁজার মতো ক্লান্তিহীন ছুটে চলার অফুরন্ত প্রাণশক্তি বা দম। চতুর্থ বিষয় হবে–ব্যাপক জনসংযোগ ও জনসম্পর্ক সৃষ্টি, রক্ষা ও লালনের ক্ষমতা। পঞ্চম বিষয়–তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও যথার্থ তথ্য বাছাইয়ের দক্ষতা। সর্বশেষ যে গুণটির ওপর জোর দেব তা হচ্ছে, শতভাগ সততা ও নৈতিক মানদণ্ডকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় মনোবল। দক্ষতা কখনো নৈতিকতা ও সততার বিকল্প নয়। একজন সৎ ও নৈতিকতার শক্তিসম্পন্ন সাংবাদিক অনেক সাহসী হন এবং তিনি দেশ ও সমাজের অমূল্য সম্পদ।

ওপরে বর্ণিত ছয়টি মৌলিক বিষয় আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার ও শাসনবিষয়ক বিশেষ রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রয়োজন হবে কিছু অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা। সেজন্য রাজনীতি বিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও লোকপ্রশাসনের কিছু বাছাই করা বিষয় গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তা না হলে দেশের সার্বিক রাষ্ট্রকাঠামোতে স্থানীয় শাসন ও সরকারের অবস্থান বুঝতে কষ্ট হবে

এবং কাজে গভীরতা থাকবে না। কিছু মৌলিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে কিছু তথ্য নিয়ে বা কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে ভালো চমকপ্রদ রিপোর্ট করা অসম্ভব নয়। কিন্তু একজন বোদ্ধা পাঠককে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। এ রিপোর্টে কিছু ফাঁক-ফোকর থেকে যেতে পারে। একশ সাধারণ পাঠককে সন্তুষ্ট করার পরও একজন বোদ্ধা পাঠকের অসন্তুষ্টি অনেক পীড়াদায়ক। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকারের আইনকানুন, প্রতিবছরের বাজেট, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আদেশাবলি সংগ্রহে থাকা প্রয়োজন। এসব দলিলাদির সফট কপির একটি নিজস্ব ভান্ডার গড়ে তুলতে পারলে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন বিষয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তথ্যবহুল প্রতিবেদন অতি সহজে করে ফেলা সম্ভব। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, নানা বিষয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের বিশ্বস্ত উৎস হিসাবে ব্যবহারের জন্য একান্ত নিজস্ব একটি রিসোর্স পারসন দল করে তাদের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে উত্তম। এভাবে নিজকে কেউ গড়ে তুললে দুই বছরের মধ্যে জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, আগ্রহী জনসাধারণ নিজে থেকেই রিপোর্টিংয়ের মাল-মশলা দিতে থাকবে। তখন যেটি করতে হবে তা হচ্ছে, বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই এবং রিপোর্ট করার কৌশলগত সময় নির্ধারণ। যেমন কিছু কিছু বিষয় স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিছু বিষয় জাতীয় ও স্থানীয় বাজেট সময়জ্ঞান, কিছু কিছু বিষয় থাকে মৌসুমি, যেমন: বন্যা, খরা ও নানা দুর্যোগ, ফসল তোলা বা লাগানো এবং সার, বীজ প্রভৃতির নানা উপকরণ সরবরাহবিষয়ক। তাই একটি প্রখর সময়জ্ঞন ও রিপোর্টিং সেন্স গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় সরকার রিপোর্টিংয়ে আগ্রহ একজন সাংবাদিক উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আগে থেকেই হোমওয়ার্ক করে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। একজন সাংবাদিকের মধ্যে এসব বিষয়ের সমাবেশ হলে স্থানীয় সরকারবিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মান অনেক বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহারে সংক্ষেপে যা বলতে চাই তা হচ্ছে–প্রথম এবং প্রধান বিষয় হলো একজন ভালো সাংবাদিক হওয়া। তারপর সাধারণ কাজের পাশাপাশি কিছু বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার এবং বিস্তৃত পরিসরে স্থানীয় শাসন সাংবাদিকতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত ক্ষেত্র হতে পারে। ইতোমধ্যে কিছু তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

লেখক: শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ

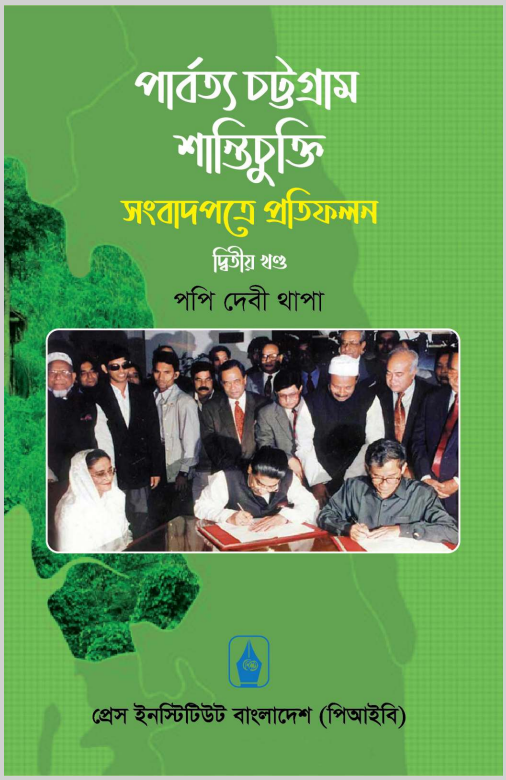

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্থানীয় সরকারের সবকিছু কেন্দ্রীভূত করে সমস্যাগুলোকে জটিল করে চলেছি

আবু আলম মো. শহিদ খান

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। মোগল সাম্রাজ্য থেকে শুরু হয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল পর্যন্ত নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে এদেশে স্থানীয় সরকারের কাঠামো গড়ে ওঠে। অবশ্য সেই কাঠামো ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-লুণ্ঠনকাজের সহায়ক ছিল। যার কোনো পরিবর্তন পাকিস্তানি শাসনামলে দেখা যায়নি। বরং পাকিস্তানি শাসকরা মৌলিক গণতন্ত্রের নামে সেই কাঠামোর যথেচ্ছ রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২-এর সংবিধানে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' স্থানীয় শাসন ও সরকারব্যবস্থা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। বিশেষত, ১৯৭২-এর সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯, ৬০ ও ১৫২ ধারায় 'স্থানীয় সরকার' বা 'স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'-এর কাঠামো, প্রকৃতি, কার্যক্রম, প্রশাসন ও অর্থায়ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সুসংহত করা, শক্তিশালী করা, স্বশাসিত করা বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্যে বিগত ৫২

বছরে সংবিধান, আইন-বিধিমালায় বহু ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা মনে করেন–স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে থাকা নিপীড়িত, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো তিন স্তরে সাজানো–ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। শহরগুলোয় পৌরসভা, নগরে সিটি করপোরেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি) স্থানীয় জেলা পরিষদ রয়েছে।

জনগণ নানান সেবা পাওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার দপ্তরে যোগাযোগ করে। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তৃণমূল পর্যায়ে কাছে পাওয়ার কথা মানুষের। কিন্তু সংবিধান, আইন, বিধিমালায় যাই বলা হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি দীর্ঘদিন ধরে অমনোযোগ আর অবহেলার শিকার। আমরা সবকিছুই কেন্দ্রমুখী করে তুলেছি, তুলছি। অথচ স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারলে তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের অধিকাংশ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সবকিছু কেন্দ্রীভূত করে আমরা সমস্যাগুলোকে জটিল থেকে জটিলতর করে চলেছি। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং সংবাদকর্মীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তব্য হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার গণমানুষের সেবা এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তাদের কাজের ক্ষেত্রগুলো হলো অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা, পরিবেশ সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আহরণ, পরিবহণব্যবস্থা, এনজিও কার্যক্রম তদারকি, অবকাঠামো মেরামত, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখাশোনা, স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও তথ্য সংরক্ষণ, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নারী ও শিশু উন্নয়ন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও যুব উন্নয়ন এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি। ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি বড়ো কাজ হচ্ছে গ্রাম আদালত পরিচালনা।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সততার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা চ্যালেঞ্জিং এবং কঠিন। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, দুর্নীতি, অদক্ষতা, অযোগ্যতা আমাদের প্রধান বাধা। স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ পায় এবং জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে। যদিও এই অর্থ বিপুল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করার প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। এরপরও এই অর্থ ব্যবহারে অনিয়ম হয়, দুর্নীতি হয়। সেবা পাওয়ার জন্য ঘুস দিতে হয়। সেবাপ্রার্থীরা দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হন। ক্ষেত্রবিশেষে নিগৃহীত হন। এসবকিছু তুলে ধরাই গণমাধ্যমকর্মীর মৌলিক দায়িত্ব।

> সবাই খারাপ বা সবকিছু নষ্টদের দখলে–এমন নাও হতে পারে। তাই দায়িত্ব পালনের সময় সৎ, সাহসী, আইনের শাসনে বিশ্বাসী মানুষের সহায়তা নিতে হবে

বর্তমানে টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র, রেডিয়ো, কমিউনিটি রেডিয়ো, সামাজিক নেটওয়ার্ক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম প্রভৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, স্থানীয় পরিষদের জবাবদিহি এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য এসব গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা সত্য প্রকাশ করবেন–সেটাই নাগরিকদের কামনা। কিন্তু আমরা সব সময় সেটি দেখি না।

তবে তথ্য সংগ্রহ সংবাদকর্মীদের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে সব তথ্য পাওয়া যায় না। তথ্য অধিকার আইনের সাহায্য নিয়েও তথ্য পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রকল্প কমিটি তথ্য দিতে চায় না।

পিআইও, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহীরা কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জায়গায় আংশিক বা খণ্ডিত তথ্য পাওয়া যায়। অনেক সময় এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, তা ছাপা ও প্রচারও হয়। সাংবাদিকতার মানদণ্ডে এগুলো সংবাদ নয়। স্থানীয় পর্যায়ে হলুদ সাংবাদিকতা, অপসাংবাদিকতা, সংবাদ প্রকাশের নামে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে; যা স্থানীয় পর্যায়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এর অবসান হওয়া দরকার। এজন্য গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের যথাযথ এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদকর্মীর জন্য সোর্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোর্স তৈরি করা কঠিন। সোর্স না থাকলে তথ্য পাওয়াও অসম্ভব। কোনো অবস্থায় সোর্সের পরিচয় প্রকাশ করে তাঁকে বিপদে ফেলা যাবে না। 'অফ দ্য রেকর্ড' কথাবার্তা প্রকাশ না করাই উত্তম। তথ্য সংগ্রহ করতে হবে বিভিন্ন সূত্র থেকে। তথ্য যাচাই-বাছাই করতে হবে। যথাযথভাবে ফ্যাক্ট চেক করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভুল তথ্যের বিস্তার (Misinformation), অপতথ্যের বিস্তার (Disinformation) ও ক্ষতিকর তথ্য প্রকাশ সাংবাদিকতা নয়। এ ধরনের তথ্য প্রকাশের জন্য মামলা হতে পারে। তাই জবাবদিহির জায়গাটি আরও পরিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তৃণমূল সাংবাদিকরা সময়ে সময়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, দলীয় ক্যাডারবাহিনী, দুর্নীতিবাজ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্নীতিবাজ সদস্য, টেন্ডারবাজ, মজুতদার, ভূমিদস্যু, কালোবাজারি, অপরাধী চক্র, বিভিন্ন পেটোয়া বাহিনীর নিগ্রহের শিকার হন। এ অবস্থার অবসান কবে হবে, সেটি নিশ্চিত নয়। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন। সেটা সংশোধন করার জন্য আলাপ-আলোচনাও চলছে। এ অবস্থায় গণমাধ্যমকর্মীদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সবাই খারাপ বা সবকিছু নষ্টদের দখলে–এমন নাও হতে পারে। তাই দায়িত্ব পালনের সময় সৎ, সাহসী, আইনের শাসনে বিশ্বাসী মানুষের সহায়তা নিতে হবে।

ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাংবাদিকতার পেশা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এ পেশায় সততা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। সমাজ উন্নয়নে বিশ্বাসী মানুষ এবং আমজনতা সৎ সাংবাদিকদের পাশেই থাকবেন।

লেখক: স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ও সাবেক সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা সমস্যা ও সম্ভাবনা

সিকান্দার ফয়েজ

স্থানীয় সরকার নিয়ে এই সময়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এ আলোচনা সর্বমহলে বিস্তৃত। তৃণমূল থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ইস্যু এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার যুক্তিসংগত কারণও রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার তৃণমূল এ ক্ষেত্রটিকে উন্নয়ন অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য স্তর বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

অনেকেই বলছেন, আজকের সমাজজীবনে আমরা যে গভীর সংকট দেখছি, যে কণ্টকাকীর্ণ পথ আমাদের সামনে বহমান এর অন্যতম কারণ তৃণমূলের এই ব্যবস্থাপনার প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলা-অনাদর। আমরা আসলে এ ক্ষেত্রটিকে নার্সিংই করিনি। গাছটি বেড়ে উঠেছে, বড়ো হচ্ছে একেবারেই অগোছালভাবে। অথচ অপার সম্ভাবনার এ ক্ষেত্রটিকে আমরা যদি সঠিকভাবে লালন করতে পারি, পরিচর্যা করতে পারি, তবে সিংহভাগ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা বুদ্ধিবৃত্তিক অশুভ তৎপরতার ছোবল থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতিকে মুক্ত করা সম্ভব। এগিয়ে নেওয়া সম্ভব শুভ ও ইতিবাচক পরিবর্তন তথা অগ্রগতির দিকে। কিন্তু সে কাজটি করা অতটা সহজ নয়। পথ খুবই বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ, তবে অসম্ভব নয়। এজন্য নানামুখী পদক্ষেপ জরুরি। এগিয়ে আসতে হবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে। এখানে সাংবাদিকরা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

স্থানীয় সরকার হচ্ছে স্থানীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা জনপ্রতিনিধিদের ফোরাম। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং দায়িত্ব পালনে আয়ের উৎস হিসাবে কর ধার্য করতে পারে। এটি স্থানীয় পর্যায়ে একটি নির্বাচিত

পরিষদ, যারা ওই এলাকার গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কল্যাণকর কাজ করতে বদ্ধপরিকর। এর মানে হচ্ছে, ওই ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসকারী গণমানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কল্যাণ এবং যা কিছু মঙ্গল, তা নিশ্চিত করার কাজটি করে স্থানীয় সরকার। আবার যা কিছু অকল্যাণ, অমঙ্গল ও নেতিবাচক, তা দূর করার দায়িত্বও তাদের। এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ–এর সবটাই সুচারুভাবে নিস্পন্ন করার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের। স্থানীয় সরকারের কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যায় সবার আগে আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে একটু জানা দরকার। স্থানীয় সরকারের মধ্যে আছে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা। আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, যেমন: আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ। জেলা পরিষদের নির্বাচনও হয়ে গেল ২০২২ সালের ১৭ অক্টোবর। উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হলেও তারা এক অর্থে কর্মহীন। একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

এবার স্থানীয় সরকারের কাজ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক। স্থানীয় সরকারের অবকাঠামোসহ উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা, পরিবেশ, বাজেটসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসাবাণিজ্য প্রসারে ভূমিকা, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় বাজার, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, জন-উদ্যোগ, পরিবহণব্যবস্থা, এনজিও কার্যক্রম ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন–এসবই স্থানীয় সরকারের কাজ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন কর্মসূচি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, স্কুল-মাদ্রাসা দেখাশোনা, অভিভাবকদের উৎসাহ দেওয়া, স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরি করা, সুপেয় বা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার কাজ করে স্থানীয় সরকার। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা, কৃষি-সেচ-পরিবেশ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও যুব উন্নয়ন এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে।

ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি বড়ো কাজ হচ্ছে গ্রাম আদালত পরিচালনা। বর্তমানে এই আদালতকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ, এটা সুষ্ঠুভাবে নিস্পন্ন করা বেশ কঠিন। আবার আছে স্বার্থবাদী চিন্তা। আছে ঘুস-দুর্নীতি-লুটপাট। আসলে স্থানীয় সরকার যেমন জাতীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ পায়, তেমনই আয় করে রাজস্ব অর্থাৎ তারা কর আদায় করে। এই যে বিপুল অঙ্কের অর্থ আসে, এটা যথাযত ব্যবহার হয় না। এর কারণ, যারা বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাদের চিন্তাচেতনায় থাকে ওই 'ইনভেস্টমেন্ট' কী করে তুলে আনা যাবে। সে কারণে তারা বরাদ্দের সিংহভাগ লুটপাটে নানা ফন্দিফিকির করতে থাকেন। সাংবাদিক খুব সহজেই এই দিকটা গণমাধ্যমে তুলে ধরে লুটপাট বন্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। কেবল তাই নয়, আরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' থাকা জরুরি। যদি 'নজর রাখা' ও 'মূল্যায়ন করা' না হয়, তবে সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা জন্ম নেয়। যার ফল দাঁড়ায় দুর্নীতি, লুটপাট আর নির্যাতন। কিন্তু একটি কাজকে সুষ্ঠুভাবে নিস্পন্ন করতে এবং লুটপাট, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত রাখতে সেখানে শক্তিশালী নজরদারি অপরিহার্য। যে কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

স্থানীয় সরকার কাঠামো ও এর কাজ সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এগুলো যদি সুসম্পন্ন করা যায়, তাহলে এলাকার উন্নয়ন অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেটা হচ্ছে কই? হচ্ছে না এ কারণে যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক সমস্যা; যা থেকে উত্তরণে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌর মেয়র, সিটি মেয়র, কমিশনার নির্বাচন করেন সেই এলাকার জনগণ। অর্থাৎ, জনগণ হচ্ছেন মালিক আর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সেবক। এ বিষয়টি উভয় পক্ষের কাছেই অস্পষ্ট। জনগণের অধিকার সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নন, আবার জনগণের সেবকরাও জানেন না তাদের অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে। জনপ্রতিনিধিরা 'জানেন না' কথাটা বলা বোধহয় সমীচীন নয়। কম জানেন কিংবা জানেন, কিন্তু মানেন না। এই যে তাঁর কী অধিকার ও দায়বোধ রয়েছে, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া জরুরি। তাতে উভয় পক্ষই লাভবান হবে। আখেরে উন্নয়ন হবে স্থানীয় সরকারের তথা দেশের। স্থানীয় সরকারের নানা ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ আসে, তা লুটপাট হয় বহুলাংশেই। এর মূল কারণ হচ্ছে, যারা নির্বাচনে অংশ নেন, তাদের সম্পর্কে আমজনতা আগেই সব বিষয় নিয়ে ভাবেন না। যেমন: যারা নির্বাচনে আসছেন, তাদের লক্ষ্যটা কী, তার পারিবারিক অবস্থা, বংশপরম্পরা, শিক্ষা-দীক্ষা, তার চিন্তাচেতনা, সেবামূলক মনোবৃত্তি এগুলো নিয়ে আমজনতার ভাবা দরকার। যে লোকটাকে আমরা ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করছি, যাকে জনগণের সেবা করার জন্য মনোনীত করছি, তার মধ্যে সেবার মনোবৃত্তি কতটা আছে জানা জরুরি। এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার–নির্বাচনে অংশ নেওয়া ব্যক্তি যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেন, সেটি তিনি 'ইনভেস্টমেন্ট' মনে করছেন কি না। যদি তাই করেন, তবে তিনি সেবকের পরিবর্তে লুটেরা হয়ে উঠবেন। যে কোনো কাজের সূচনা হয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি ওয়ার্ড কমিটির কথা যদি বলি, তাদের দায়িত্ব ওই ওয়ার্ডে কী কী প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা। ওয়ার্ড কমিটি চাহিদাপত্র তৈরি করে চেয়ারম্যান বা মেয়রকে জানাবেন। সে মোতাবেক স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে কার্যাবলি সম্পন্ন হবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। হচ্ছে উলটোটা। যেখানেই উলটোপথ, সেখানেই দুর্নীতির বীজ থাকে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা জরুরি। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে আমরা যদি সচেতন সমাজ এবং সাংবাদিকদের সম্পৃক্ত করতে পারি, তবে পাহাড়সম সমস্যা সহজেই দূর করা সম্ভব। এজন্য দরকার পরিশীলিত চেতনার চর্চা। স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা যদি শক্তিশালী হয় তবে স্থানীয় সরকারও শক্তিশালী হবে–নিঃসন্দেহে সেটা বলা যায়। কারণ, জবাবদিহির ক্ষেত্র প্রশস্ত হলেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ কাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য। একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বলা দরকার, তাহলো শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ছাড়া উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব। আজকের যে সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়, যে ভয়-শঙ্কা আমাদের তাড়িত করছে, এর পেছনেও লুকিয়ে আছে স্থানীয় সরকারের ব্যর্থতা। যে মূল্যবোধ সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তা আমরা হারাতে বসেছি। যা ফিরিয়ে আনতে আমরা যদি এখনই বৃহত্তর পদক্ষেপ না নিই তবে এ ক্ষয়িষ্ণু সমাজ এক রূঢ় বাস্তবতার সামনে আমাদের দাঁড় করাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার মসৃণ কোনো পথ আমরা শীঘ্রই খুঁজে পাব না। আমাদের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথকে মসৃণ করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। বিষয়টিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে চলবে না। স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা–দুটি বিষয়কে পরিপূরক করা না গেলে সমস্যা থেকে উত্তরণ অকল্পনীয়। সেই সঙ্গে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতার ধরনও বদলাতে হবে। কেবল ডে-ইভেন্ট নয়, এগোতে হবে ইনডেপথ রিপোর্টিংয়ের দিকে। সেই সঙ্গে উন্নয়ন

> স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা–দুটি বিষয়কে পরিপূরক করা না গেলে সমস্যা থেকে উত্তরণ অকল্পনীয়। সেই সঙ্গে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতার ধরনও বদলাতে হবে

সাংবাদিকতা এবং সাকসেস স্টোরি আমাদের চিন্তার পথকে আরও আলোকিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। এখন গণমাধ্যমের একটা নবজাগরণ চলছে। সংবাদপত্র, রেডিয়ো-টিভি, বিভিন্ন চ্যানেল, অনলাইন, কমিউনিটি রেডিয়ো, (কমিউনিটি টেলিভিশনও আসতে পারে), ফেসবুক তথা সামাজিক নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি এখন অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে সমাজ বিনির্মাণে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে এসব গণমাধ্যমকে নিরলসভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

এবার স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক। স্থানীয় সরকারের যেসব বিষয়-আশয় নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি এর আলোকে সংবাদ রচনা ও গণমাধ্যমে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের ব্যবস্থাই হচ্ছে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা। স্থানীয় সরকারের বিষয় নিয়ে লেখালেখি নতুন নয়। তবে সময় এসেছে এর পরিশীলিত চর্চার। যদিও সেটা সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে রয়েছে অনেক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ। এখানে আমরা চতুর্মুখী একটা সংকট দেখতে পাই।

প্রথমত, সংবাদ লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহে সমস্যা। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হলেও সেখানে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি কাজের স্বচ্ছ তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, মেম্বার, পিআইও-এর দ্বারস্থ হলেও তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পাওয়াই যায় না। আর পাওয়া গেলেও তা হয় আংশিক, খণ্ডিত। এ বিষয়ে জবাবদিহির জায়গাটি আরও পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকরা সুপ্রশিক্ষিত ও দক্ষ নন। তাঁরা ইনডেপথ রিপোর্টিং সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। সংবাদ লেখা ও সম্পাদনার বিষয়েও তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের সেই প্রশিক্ষণ না থাকায় তাঁরা বিষয়গুলোকে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারেন না। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তৃতীয়ত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পেটোয়া বাহিনী এবং হামলা-মামলার ভয়, এটি স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য একটা বড়ো সমস্যা। সেই সঙ্গে কিছু আইনগত প্রতিবন্ধকতার কথাও আলোচিত হচ্ছে। ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে কিছু বিদ্যমান আইন। উদাহরণস্বরূপ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের (আইসিটি অ্যাক্ট) কথা বলা যায়।

চতুর্থত, স্থানীয় সরকারবিষয়ক প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। কোনো গণমাধ্যমেই স্থানীয় সরকারবিষয়ক প্রতিবেদনটি প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচারের নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ, সংবাদপত্র, চ্যানেল বা অনলাইন যে মাধ্যমের কথাই বলি না কেন, কর্তৃপক্ষের পলিসি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখনো স্থানীয় সরকার বিট নির্ধারণ নিশ্চিত হয়নি। ফলে এ ধরনের লেখা এখনো কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এ বিষয়েও পলিসিগত আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে। এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে হবে।

একটি শঙ্কার কথা এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে এ আলোচনার যবনিকা টানতে চাই। গত তিন দশকে আমাদের সাংবাদিকতার অকল্পনীয় উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে সংবাদপত্র, বিভিন্ন চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিয়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রভূত উন্নতি করেছে। কমিউনিটি টেলিভিশনের দাবিও সোচ্চার। একমাত্র সংবাদপত্র ছাড়া সব মাধ্যমই ডে-ইভেন্টনির্ভর। চ্যানেলগুলো স্ক্রলে প্রতিনিয়ত আপডেট জানিয়ে দেয়। অনলাইন ঘণ্টায় ঘণ্টায় আপডেট দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আজকের সংবাদপত্রও অনেকটাই ডে-ইভেন্টনির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিনিয়তই সংবাদপত্রের পাঠক বাসি খবর পড়ছে। এখনো পাঠক এই বাসি খবর বর্জনে সরব হয়ে ওঠেনি। তবে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন গ্রামে-গঞ্জে ব্যাংকের মতো বুথ তৈরি হবে, যেখানে একটি ইলেকট্রিক বোর্ডে কার্ড পাঞ্চ বা পাসওয়ার্ড দিয়ে পাঠক প্রতিদিনের খবরটি অনলাইন গণমাধ্যমে পড়ে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে। ফলে একই চর্বিতচর্বণ, বাসি লেখাসমৃদ্ধ পত্রিকাটি আর সে ছুঁয়েও দেখবে না। এই ঝুঁকি এড়াতে আমাদের সংবাদপত্র তথা প্রিন্ট মিডিয়াকে ইনডেপথ রিপোর্টিং, ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টিং এবং সাকসেস স্টোরির দিকে এগোনোর কোনো বিকল্প নেই। খবরের পেছনের খবর পাঠককে সব সময়ই আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণ খুঁজে পেতে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা এতক্ষণের আলোচনায় সবাই একমত হব যে, স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন-অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই সুযোগ উন্মুক্ত হলেও আমরা এখনো সেটা গ্রহণ করতে পারিনি। এর কারণ, আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, চর্চার অভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ না পাওয়া। এ কথা অনস্বীকার্য যে, জানার কোনো শেষ নেই এবং জানার কোনো বিকল্প নেই। এই জানতে হলে চাই পড়ালেখা।

একসময় সাংবাদিকতায় সম্পৃক্তজনের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। ঢাকার বাইরের কথা যদি বলি, জেলা শহরেও কটি সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা বা অন্য গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ছিল? নিতান্তই হাতে গোনা বলা যায়। অনেক জেলা থেকে সংবাদ আসতে কখনো কখনো ৩-৪ দিন লেগে যেত। কোনো কোনো জেলার ক্ষেত্রে লেগে যেত ৬-৭ দিন। সেটা আশির দশকের কথা। কিন্তু আজ? বিজ্ঞান আজ আমাদের অনেক অনেক

দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখন তৃণমূল পর্যায়ে সাংবাদিকদের পদচারণা। এখন এমন কোনো গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেখানে একদল সাংবাদিক খবর খোঁজায় ব্যস্ত থাকেন না। আর সিটিজেন জার্নালিজমের কথা যদি বলি, তো ঘরে ঘরে ঢু মেরেই তাদের দেখা মিলবে–সেদিন খুব বেশি দূরে না। এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা কি অধিক গুরুত্ব বহন করে না? আমরা এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে চাই। সে কারণেই আমরা বলতে চাইছি, স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, বিষয়টি এখনই আলোচনায় তোলা হোক।

অধিকতর শিক্ষা ছাড়া অধিকতর দক্ষতা আসে না। অথচ আমরা এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি একেবারেই অগোছালভাবে। শুধু একদিনের বা কয়েক ঘণ্টার প্রশিক্ষণ কতটুকু সাফল্য এনে দিতে পারে? আমরা মনে করি, স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতাকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর উন্নয়ন অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যায়। আমরা যদি গভীরভাবে অবলোকন করি তাহলে দেখা যাবে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতার সঙ্গে কতগুলো পক্ষ সম্পৃক্ত। যেমন: ১. সাংবাদিক, ২. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ৩. প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি, ৪. সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, ৫. ভুক্তভোগী, ৬. অপরাধী চক্র, ৭. প্রভাবক এবং ৮. আমজনতা।

স্থানীয় সরকারের প্রতিটি বিষয়ের ভালোমন্দের সঙ্গে, উন্নতি-অবনতির সঙ্গে এসব পক্ষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এরাই আসলে দেশের মূল চালিকাশক্তি। প্রতিটি পক্ষের সঙ্গেই সাংবাদিকের সম্পৃক্তি নিবিড়। সুতরাং, তার প্রভাবক শক্তির বিস্তারে সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত সংবাদকর্মীর দায়দায়িত্ব অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি বলে আমি মনে করি। কেননা তৃণমূলের যে পর্যায় থেকে তাঁকে সংবাদ তুলে আনতে হয় এবং লেখার সময় তাঁর প্রভাব সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হয়, সেটা অন্য কোনো ক্ষেত্রে ততটা প্রয়োজন পরে না।

আমি গত কয়েক বছরে অন্তত ১২টি জেলার ৩ শতাধিক সাংবাদিকের সঙ্গে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা ও এর বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলেছি। তাদের সঙ্গে দিনব্যাপী আলোচনা হয়েছে নানা অনুষঙ্গ নিয়ে। তারা অনেক কিছু জানতে চায়। যেখানে তাদের কাছে বেসিক জার্নালিজমই স্পষ্ট নয়, সেখানে অ্যাডভান্সড, ইনডেপথ এবং ইমপ্রেসিভ জার্নালিজমের ধারণা বেশ কঠিন বিষয়। এ বিষয়কে সহজ করার জন্য 'স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা' পাঠ্যসূচিভুক্ত করা জরুরি।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কবি ও কথাসাহিত্যিক

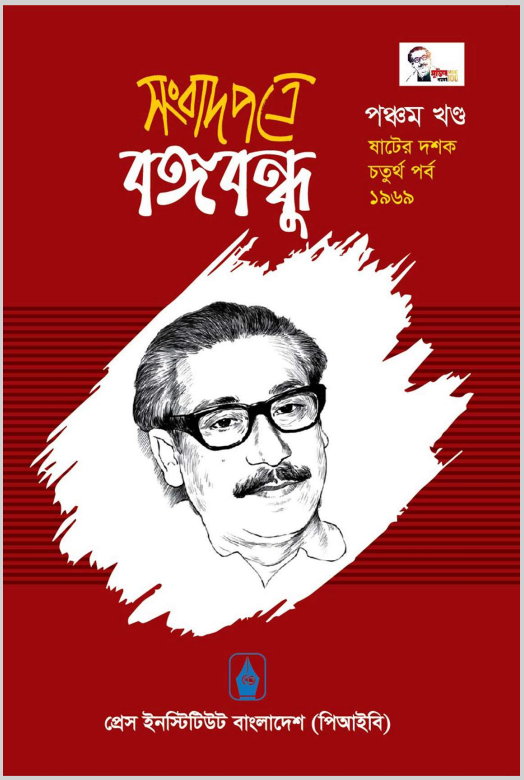

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্মার্ট বাংলাদেশে স্থানীয় অর্থনীতি এবং স্থানীয় সরকার

নিরঞ্জন রায়

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্ধশতাব্দীর পথচলায় গত দেড় দশক হচ্ছে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাইলফলক। এই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক খাতে যে মাত্রার উন্নতি হয়েছে, তা এর আগে কখনোই হয়নি। এমনকি বিশ্বের আর কোনো দেশেও সেভাবে হয়নি। এর অন্যতম কারণ বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটানা এক দশকের বেশি সময় সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারাবাহিকতা এবং এই দীর্ঘ শাসনামলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিশেষ করে দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে অনেক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষি উন্নয়নে ভরতুকিসহ কৃষিবান্ধব নীতি প্রণয়ন, বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দেশকে উন্নত বিশ্বের আদলে প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করে এখন স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কর্মসূচি গ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। সবকিছু ছাড়িয়ে দেশে ডেল্টা প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় আগামী একশ বছরের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক ডজনেরও অধিক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের শেষ পর্যায় নিয়ে আসা। কয়েকটি মেগা প্রকল্প যেমন: পদ্মা সেতু, ঢাকার মেট্রোরেল, চার ও ছয় লেনের মহাসড়ক নির্মাণ এবং রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়ে চালুও হয়ে গেছে। আরও কয়েকটি মেগা প্রকল্প যেমন: কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে

বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ এবং ডাবল লাইনের রেলযোগাযোগ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এবং খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

অবকাঠামো নির্মাণ ও অর্থনৈতিক উন্নতি: অনেকেই ভাবতে পারেন যে এরকম দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির এমন কী সম্পর্ক থাকতে পারে। সম্পর্ক অবশ্যই আছে। আমরা যারা অর্থনীতি ও ফিন্যান্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি এবং এখনো এ বিষয় নিয়েই কাজ করে থাকি, তারা খুব ভালো করেই জানি যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে অবকাঠামো নির্মাণের সরাসরি একটা সম্পর্ক আছে। একটি দেশের অবকাঠামো হচ্ছে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান। এটা আজ সর্বজনবিদিত, অবকাঠামো নির্মাণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে। পশ্চিমা বিশ্ব যে অর্থনৈতিকভাবে এত বেশি উন্নতি লাভ করেছে, এর মূলে আছে তারা ব্যাপক হারে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো নির্মাণ করতে পেরেছে। যত অবকাঠামো, তত অর্থনৈতিক উন্নতি। আবার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয় আগামী একশ বছরের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে। ফলে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয় বর্তমানে; কিন্তু এর অর্থনৈতিক সুবিধা আসতে থাকবে আগামী একশ বছর ধরে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার এই মূলমন্ত্রটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ কারণেই তিনি তাঁর দেড় দশকের শাসনামলে এতগুলো দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে মেগা প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছেন। সামসময়িক বিশ্বে বাংলাদেশ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে এত মেগা প্রকল্প একসঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের সুফলও বাংলাদেশ পেয়েছে বেশ ভালোভাবেই। বাংলাদেশ যে বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মেগা প্রকল্প গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়ন, যা মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক অবদান হিসাবেই উল্লেখ করা যেতে পারে; যদিও তাঁর পেছনের শক্তি দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন।

গ্রামীণ ও শহরের অর্থনীতির উন্নতি: বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, এর কিছু বহুমাত্রিক দিক আছে, যা আগে সেভাবে হয়নি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক যে উন্নতি হয়েছে, সেখানে গ্রামীণ ও শহরের অর্থনীতি এগিয়েছে সমান তালে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ৩০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যতটুকুই উন্নতি হয়েছে, এর পুরোটাই শহরকেন্দ্রিক। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেই উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি। কিন্তু বিগত দেড় দশকের যে অভূতপূর্ব উন্নতি, সেখানে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। আসলে ব্যতিক্রম ঠিক নয়, বরং স্বাভাবিক উন্নতির ধারা লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ শহরের উন্নতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনেও আধুনিকতার 'ছাপ' লেগেছে। এখন জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে শহর ও গ্রামের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক নগরজীবনের সব সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে গেছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। পাকা দালান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, গ্যাস, টেলিভিশন, ফ্রিজ–সবকিছুই এখন গ্রামীণ জীবনের সহজলভ্য উপাদান। গ্রামের রাস্তাঘাটও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং সর্বত্রই পিচঢালাই রাস্তা। গ্রামের মেঠোপথ এখন সাহিত্য ও ইতিহাসেই পাওয়া যায়। এককথায়–বিগত দেড় দশকে গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবনে উন্নতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, যা মূলত বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তিকে আরও মজবুত ও টেকসই করবে। আর এ কারণেই গ্রামের অর্থনীতি এবং গ্রামীণ জীবনে যে উন্নয়নের ঢেউ লেগেছে, একে আরও সুসংহত ও দীর্ঘমেয়াদি করার প্রচেষ্টা শুধু অব্যাহত রাখলেই চলবে না, সেই সঙ্গে এই উদ্যোগকে আরও বেগবান করতে হবে। আর এখানেই আছে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব।

গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি: আমাদের দেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদানই সর্বোচ্চ। ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর রয়ে গেছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। এর কারণ আমাদের দেশের মাটি খুবই উর্বর। পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে, সেখানে এত সামান্য পরিশ্রমে ভালো ফসল ফলানো যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশ এবং নিয়মিত বিরতি দিয়ে ঘটে যাওয়া বন্যা আমাদের দেশের মাটিকে প্রাকৃতিকভাবেই উর্বর করে রাখে। তাছাড়া আমাদের রয়েছে কঠোর পরিশ্রমী কৃষক। আমাদের দেশের কৃষক যেভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ফসল উৎপাদন করে, তেমনটাও বিশ্বের খুব কম দেশেই আছে। আমাদের দেশের কৃষি আমাদের অর্থনীতির জন্য অমূল্য খাত। বিশ্বের অনেক দেশেই কিছু বিশেষ খাত থাকে যেমন: খনিজ পদার্থ, জলজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি; যা সেসব দেশের একান্তই নিজস্ব বিষয়। কৃষিও তেমনই আমাদের দেশের একান্তই নিজস্ব বিষয়, যা আমাদের অর্থনীতিকে করে রেখেছে সমৃদ্ধ। দেশের অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতেও যে ব্যাপক উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে, তা খুব সহজেই দৃশ্যমান। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, গুণগত মান উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদনের বহুমুখীকরণ–এর সবই এখন আমাদের দেশের কৃষি খাতে নিয়মিত ঘটনা। কৃষি উৎপাদনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিও বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। এখন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এর অধিকাংশ আবার গড়ে উঠছে গ্রামের মানুষের নিজস্ব উদ্যোগে এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হিসাবে। যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন, গ্রামীণ অর্থনীতির এই যে বহুমুখীকরণ, তা অব্যাহত রাখতে পারলে দেশের অর্থনীতির একটি কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হবে এবং সেই কাঠামো একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু এ কথাও ঠিক, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঠিক পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা দিতে না পারলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যম হিসাবে স্বোদ্যোগে গড়ে ওঠা ব্যাবসা বা কার্যক্রম বেশি দিন টিকতে পারে না। এ কারণেই তাদের প্রচেষ্টাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার স্বার্থে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার কোনো বিকল্প নেই। এখানেও রয়েছে স্থানীয় সরকারের বড়ো ভূমিকা।

কৃষি ও অকৃষি খাত: গ্রামীণ অর্থনীতিতে এখন কৃষি ও অকৃষি খাতে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আর্থিক কর্মকাণ্ডের মাত্রা এবং পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। এখন পরিবারের প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি কোনো না কোনো আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি এতটাই ব্যাপক যে গ্রামীণ জনপদে এখন দেশের সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের এক অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের একজন রিকশাওয়ালা দিনে ৪০০-৫০০ টাকা উপার্জন করেন, যা প্রতিমাসে দাঁড়ায় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। একইভাবে একজন দিনমজুরও মাসে ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা উপার্জন করেন। একজন চায়ের দোকানদার বা একজন পানের দোকানদারও মাসে ২০

> বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, এর কিছু বহুমাত্রিক দিক আছে, যা আগে সেভাবে হয়নি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক যে উন্নতি হয়েছে, সেখানে গ্রামীণ ও শহরের অর্থনীতি এগিয়েছে সমান তালে

থেকে ২৫ হাজার টাকা উপার্জন করে থাকেন। এমনকি একজন বেকার যুবকও গৃহশিক্ষকতা করে বা কোনোরকম সেবামূলক কাজ করে মাসে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারেন। এমনকি পরিবারের যে নারী সদস্য, তিনিও হাঁস-মুরগি বা গোরু-ছাগল পরিপালন করে মাসে ১০-১২ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারেন। দ্রব্যমূল্যের যতই ঊর্ধ্বগতি হোক না কেন, গ্রামের জীবনযাত্রার মান সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি যে এসব উপার্জনের পুরোটাই খরচ হয়ে যাবে। এর কারণ, জীবনযাত্রার ব্যয়ের বড়ো দুটি খাত হচ্ছে বাড়ি ভাড়া ও যাতায়াত ব্যয়, যা গ্রামে খুবই সামান্য এবং একদম নেই বললেই চলে। কারণ, গ্রামের মানুষ তাদের নিজেদের বাড়িতেই বসবাস করে এবং হেঁটেই চলাচল করে থাকে। পক্ষান্তরে এ দুটি খাতেই শহরে বসবাসকারীদের তাদের উপার্জনের বড়ো একটি অংশ ব্যয় করতে হয়। সেই বিবেচনায় গ্রামের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের ভালো অঙ্কের সঞ্চয়ের সুযোগ আছে, যা দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন গঠনে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ না থাকায় এই ব্যাপক উপার্জন সেভাবে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি বা মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ কারণেই গ্রামের অর্থনীতিতে যে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠনের অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, একে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে অবদান রাখার সুযোগ করে দিতে হবে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকেও আধুনিকায়ন করতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সন্নিবেশিত করা: গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হয়েছে, যেভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং বহুমাত্রিকতা এসেছে, সেসব সুযোগকে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত ও সুসংহত করার এখনই উপযুক্ত সময়। প্রথমেই কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে শহরের বাজারব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে গ্রামের বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। বিশেষ করে কৃষকদের সমন্বয়ে যদি প্রতিটি গ্রামে আধুনিক স্টোরেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে দুটো উদ্দেশ্য যুগপৎ অর্জিত হতে পারে। প্রথমত, কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি বাজারে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতাও আসবে। একইভাবে যারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছেন, তারা যেন সঠিকভাবে মূলধন ব্যবস্থাপনা রপ্ত করতে পারেন এবং সব সময় একটি বিকল্প কর্মসংস্থান বা কার্যক্রমের সুযোগ বিবেচনায় রাখে সেই প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কে একটা বহুল প্রচলিত কথা আছে যে, প্রায় চল্লিশ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থান শুরুর তিন বছরের মাথায় হারিয়ে যায় নানান কারণে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা সঠিকভাবে ব্যয়নির্বাহ করতে পারেন না এবং মূলধনও ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সঠিক পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদানের কাজটি করতে হবে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে।

স্থানীয় সরকারের ভূমিকা: আমাদের অর্থনীতি এবং সামাজিক খাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব এবং ভূমিকা পরিবর্তিত বা উন্নীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অথচ এই মুহূর্তে এ কাজটিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। অতীতে আমাদের স্থানীয় সরকারের ভূমিকা মূলত দুস্থদের মাঝে সাহায্য প্রদান, রিলিফ বিতরণ, স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ বা মেরামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত এবং এখনো হয়তো থাকে। কিন্তু সময় এসেছে স্থানীয় সরকারকে এসব কাজের বাইরে এনে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুসংহত করার কাজে নিয়োজিত করার। তাদের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় ট্রেডিং প্ল্যাটফরম গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এই প্ল্যাটফরমে দেশব্যাপী অনলাইনে গ্রামে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পূর্বনির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব। যারা উৎপাদন করবেন, যারা ক্রয় করবেন এবং যারা পণ্যসামগ্রী নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেবেন–তারা সবাই এই স্থানীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত ট্রেডিং প্ল্যাটফরমের সদস্য হয়ে কাজটি করবেন। স্থানীয় সরকার এখানে অনলাইনভিত্তিক ট্রেডিং ব্যবস্থাকে সহযোগিতা দেবে এবং লেনদেনের সঙ্গে জড়িত সদস্যদের জাল-জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা করবে। একইভাবে যারা আত্মকর্মসংস্থানের কাজে নিয়োজিত, একটি নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে কীভাবে তাদের উদ্যোগকে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়, সেই প্রচেষ্টাও থাকতে হবে স্থানীয় সরকারের দিক থেকে।

বেকার যুবকদের নিয়োজিত করা: বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৭ কোটি জনসংখ্যার ১২ কোটির অধিক মানুষ এখন কর্মক্ষম। এই বিশালসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করা মোটেই সহজ কাজ নয়। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি এবং এই সমস্যা শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশি প্রকট। অথচ এই বেকার যুবকদের খুব সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের দেশে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর পার হয়ে যেতে হয়। অবশ্য আধুনিক বিপণনব্যবস্থার ধরনই এমন এবং এই ব্যবস্থা শুধু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেই নয়, উন্নত দেশেও বিদ্যমান। এর কারণ, ভোক্তা এখন তার সুবিধামতো স্থান থেকে সুশৃঙ্খলভাবে পণ্যসামগ্রী পেতে চায়। অপরদিকে উৎপাদকও তার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী হাতের কাছে নির্বিঘ্নে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিক্রি করতে চায়। দুই পক্ষের এই চাওয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের বিপণনব্যবস্থা এবং পণ্য স্থানান্তর বা ডেলিভারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এবং এর

সহজলভ্যতা কাজটিকে আরও সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা এখনো সেভাবে গড়ে উঠেনি। তবে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। বরং যত দ্রুত এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, ততই দেশের অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থার জন্য মঙ্গল। এই কাজে অবশ্য দেশের, বিশেষ করে গ্রামের বেকার যুবকদের কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন স্থানীয় সরকারের অধীনে যদি একটি জাতীয় ট্রেডিং প্ল্যাটফরম গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে সেখানে খুব অনায়াসে বেকার যুবকদের নিয়োজিত করা সম্ভব। গ্রামের সব বেকার যুবকের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর তাদের একটি সনদ দিয়ে জাতীয় ট্রেডিং প্ল্যাটফরমের সদস্য হিসাবে নিবন্ধন করা যেতে পারে। এই সদস্যদের যোগ্যতা অনুযায়ী তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এদের এক দল পণ্যসামগ্রী পূর্বনির্ধারিত মূল্যে উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রয় করবে এবং দ্বিতীয় গ্রুপ নির্ধারিত মূল্যে খুচরা বিক্রেতা বা সেলস আউটলেটের কাছে বিক্রি করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। তৃতীয় গ্রুপ ক্রয়-বিক্রয় করা পণ্যসামগ্রী উৎপাদকের কাছ থেকে খুচরা বিক্রেতা বা সেলস আউটলেটে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবে। এটি নেহায়েতই একটি উদাহরণ মাত্র। বাস্তবতার আলোকে বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এরকম কিছু কাঠামো যে গড়ে তোলা সম্ভব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মোট কথা, দেশের বেকার যুবকদের কাজে লাগিয়ে এরকম একটি পদ্ধতিগত বিপণনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে অনেক উদ্দেশ্য একসঙ্গে হাসিল করা সম্ভব। প্রথমত, বেকার সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হবে। দ্বিতীয়ত, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য অনেকাংশেই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, পণ্য সরবরাহ বা সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হবে। চতুর্থত, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

দীর্ঘসূত্রতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার লাঘব: অনেকে অবশ্য ভাবতে পারেন যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আধুনিকায়নের নামে স্থানীয় সরকারকে এভাবে সম্পৃক্ত করার কারণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের ভোগান্তি বাড়বে। ফলে দুর্নীতি আরও বেড়ে যেতে পারে। এখনো যে এসব অভিযোগ কম আছে, তা তো নয়। সেক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতি চালু করে যদি এসব অভিযোগ থাকে তাহলেও একটা সান্ত্বনা থাকবে যে কিছু তো একটা হয়েছে। এর চেয়েও বড়ো কথা, আগামী দিনের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং স্থানীয় সরকার উভয়ই হবে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর। আর প্রযুক্তি সঠিকভাবে নির্মাণ এবং ব্যবহার করতে পারলে অধিকাংশ কার্যক্রমই সম্পন্ন হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং মানুষের খুব একটা ভূমিকা থাকবে না। ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতির সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হলেও অনেকাংশে কমে যাবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের আদলে গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলা: দেশের অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিকে একদিকে যেমন টেকসই এবং দৃঢ় করতে হবে, অন্যদিকে তেমনই আধুনিকায়নও করতে হবে। আবার গ্রামীণ অর্থনীতি টেকসই এবং আধুনিক করতে হলে স্থানীয় সরকারের পরিধি ও কলেবর যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই এই সংস্থাকেও আধুনিক এবং উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ পার করে এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং আগামী দিনের সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনীতি যে হবে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এখন থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার কাজ হাতে নিতে হবে। আর এই কাজ হাতে নিতে হলে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকেও হতে হবে আধুনিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর। স্থানীয় সরকার নিজেরা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠলেই তারা গ্রামীণ অর্থনীতিকেও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে। মোট কথা, প্রযুক্তিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে আধুনিক স্থানীয় সরকারের সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ।

লেখক: কলামিস্ট, ব্যাংকার

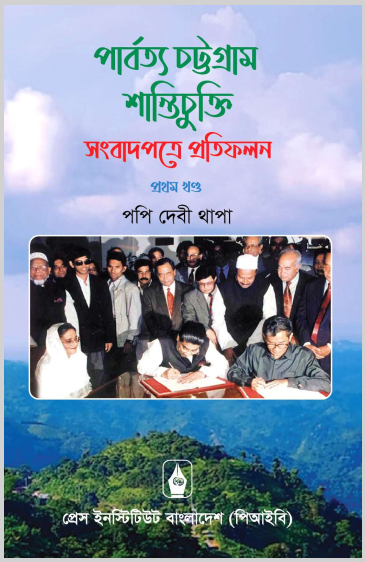

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শহর উন্নয়ন, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা

আবুজার

উন্নয়ন মূলত একটি অর্থনৈতিক ধারণা। যার ইতিবাচক অর্থ রয়েছে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য এবং উপলব্ধ সংস্থানগুলো ব্যবহার করার জন্য কিছু অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পদক্ষেপের প্রয়োগে জড়িত। উন্নয়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যা বৃদ্ধি, অগ্রগতি, ইতিবাচক পরিবর্তন বা ভৌত, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং জনসংখ্যার উপাদানগুলোর সংযোজন সৃষ্টি করে (আলম, ২০২১)। গণমাধ্যম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, কৃষি, জীবিকা, বাক্‌স্বাধীনতা, মানবাধিকার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং জনসচেতনতা থেকে শুরু করে সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলোয় অবদান রাখছে (হাসান, ২০২২)। গণমাধ্যম যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এটি এমন একটি প্ল্যাটফরম, যা বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে তথ্যের বিনামূল্যে প্রবাহের অনুমতি দেয়। এটি এমন একটি সরঞ্জাম, যা সচেতনতা তৈরি করতে, শিক্ষিত করতে, এমনকি আমাদের বিনোদন দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অপব্যবহার হলে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি ও প্রভাব বহুগুণ যেমন বেড়ে গেছে, তেমনই গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের গুরুত্বও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। রেডিয়ো, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, অনলাইন বা সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমের প্রসারে সাংবাদিকতার ধরন বা ধ্যানধারণাও পালটে গেছে অবিশ্বাস্যভাবে (মিত্র, ২০১৫)। অতীতে যেখানে মানুষ সত্য, সুন্দর বা শান্তির অন্বেষণে ছাপাখানাকেন্দ্রিক গণমাধ্যম সাংবাদিকতায় নাম লেখাতেন; এখন এই সময়ে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিতে স্যাটেলাইট টিভি, অনলাইন টিভি, এফএম রেডিয়ো, কমিউনিটি ও সিটিজেন রেডিয়ো এবং ব্যক্তিগত ব্লগ, ফেসবুক, টুইটার বা অপরাপর যোগাযোগমাধ্যমে আপামর সাংবাদিকের নামটি যত্রতত্রই দেখতে পাওয়া যায় (আহম্মেদ, ২০১৭)। এতে আধুনিক শহুরে সাংবাদিকতা দেশ বা দেশের অধিবাসীদের ভেতরের চেতনার পরিবর্তন ও উন্নয়নের জায়গাটি আমূল পালটে দিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং জনগণের জীবনের সব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পছন্দের পরিধিকে উন্নত করা (মার্টানা ও হাসানপার, ২০১৪)। বিশ্বে গণমাধ্যম নিঃসন্দেহে একটি বড়ো ও শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রায় সব ঘটনাবলির ওপর নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব রাখে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষকেই নাগরিক হিসাবে তাদের চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। গণমাধ্যম সেসব কর্ম, সমস্যা ও দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে এবং বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সমাধানকল্পে জনমতও গঠন করে থাকে। গণমাধ্যম রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে মানুষকে সংগঠিত করতে পারে। সাংবাদিক তাদের সৃষ্টিশীল ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সমাজের নানা বৈষম্য, মানুষের অজানা কষ্ট, অদৃশ্য বিপর্যয় এবং গ্রামীণ ও শহরের বঞ্চিত জনগণের বহুবিধ সমস্যার বাস্তব পরিস্থিতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের পথ বাতলে দিতে পারে (চৌধুরী, ২০২১)।

উন্নয়ন একটি স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। উন্নয়নের দুটি দিক হলো–অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা মানুষের আয়বৃদ্ধি আর সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য এবং সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থা (আব্রাহাম ও খুসবো, ২০২২)। কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, আবাসন, শহর ও গ্রামীণ উন্নয়নবিষয়ক নানা বিষয় গণমাধ্যমে উন্মোচন করা যেতে পারে। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গণমাধ্যমের ব্যবহার নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু হয়েছে। কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, পল্লি উন্নয়নসহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে (ইসলাম, ২০২১)। বস্তুত প্রতিটি দেশেরই সার্বিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর ও সক্রিয় গণমাধ্যম জরুরি। কেননা রাষ্ট্র ও সমাজ উন্নয়নে গণমাধ্যম সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করছে। আমাদের দেশেও কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে কোনো কোনো চ্যানেল বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এমনইভাবে প্রায় প্রতিটি গণমাধ্যমই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। গণমাধ্যম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের আশপাশের ঘটনা, তথ্য-উপাত্ত পরিবেশন করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করে সমাজের নানা অসংগতি জনমানুষের সামনে তুলে ধরে। সমাজের অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখায়। সত্যিকার অর্থে, গণমাধ্যম হলো একটি যুগের প্রতিনিধি। শিক্ষিত, উন্নত, সমৃদ্ধিশালী ও প্রগতিশীল শহর গঠনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অতুলনীয়। শহরের অন্যায়-অনিয়ম, দুর্নীতি, ধর্ষণ-সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্ম রুখতে চাইলে সাহসী ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা জরুরি (রহমান, ২০১৯)। গণমাধ্যম যে কোনো শহরের উন্নয়নের সেরা বন্ধু, বিশেষত সংকটময় মুহূর্তগুলোয়। সংকটকালে আমাদের বড়ো শত্রু হলো প্রকৃত ঘটনা বা সত্যকে আড়াল করা; যা সরকার, দেশ ও শহরের জন্য অনেক বড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। অপরদিকে পরিস্থিতির ভয়াবহতায় সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলোয় আলো ফেলতে পারে একমাত্র গণমাধ্যম। গণমাধ্যম ছাড়া কোনো সরকারের উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে দেওয়া অন্য কোনো মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব নয় (রায়, ২০১৩)। উন্নয়নের ফলে মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি গঠন এবং প্রযুক্তি বিষয় ধরে ধনী ও দরিদ্র দেশে কাজ করে, যদিও তাদের একত্রিত করার জন্য মিশ্রণ ও কৌশল রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে। আবার গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের নিবিড়তম সম্পর্ক রয়েছে। গণযোগাযোগ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহকে উপেক্ষা করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি শুধুই কল্পনাবিলাস বৈ আর কিছু নয়। আধুনিক গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে (আব্রাহাম ও খুসবো, ২০২২)। মূলত সংবাদপত্র আর সংবাদকর্মীর মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, জনমত সৃষ্টি ও সমাজের ভালো-মন্দের প্রতিফলন ঘটে। বর্তমান প্রবন্ধে এসব দিক বিবেচনা করে গণমাধ্যমে নগর বা শহরের উন্নয়নে কোন কোন বার্তা প্রচার ও প্রকাশ করা হয়, বার্তা প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতিবন্ধকতা এবং সর্বোপরি গণমাধ্যম শহরের উন্নয়নে কেমন ভূমিকা পালন করছে, তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

শহর উন্নয়নের ধারণা

শহর উন্নয়ন হলো একটি হাতিয়ার, যা একটি শহরকে নগরায়ণের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। এটি একটি শহরকে সমন্বিত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম করে তোলে, যাতে সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। শহরগুলো পুরো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৮০ শতাংশ উৎপন্ন করবে বলে অনুমান করা হয়। OECD গবেষণায় দেখা যায়, জনসংখ্যার আকারের প্রতিটি দ্বিগুণ হওয়ার জন্য উন্নত শ্রম বিতরণ, শিক্ষা, উদ্যোক্তা, ধারণার প্রসার প্রভৃতির ফলে একটি শহরের উৎপাদনশীলতার মাত্রা ২-৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (মার্টানা ও হাসানপার, ২০১৪)। এটা নগর পরিকল্পনা, শহর পরিকল্পনা বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা নামেও পরিচিত। একটি প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা ভূমি ব্যবহারের উন্নয়ন ও নকশা, বায়ু, পানি এবং অবকাঠামো পাশসহ নির্মিত পরিবেশের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শহর উন্নয়ন হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার, কঠিন বর্জ্য, বাজার, ফুটপাত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার জন্য অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা আর এ বিষয়গুলো সাধারণত ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাসহ নির্দিষ্ট সেক্টর প্রোগ্রামের অংশ গঠন করে। বড়ো শহরগুলোর বস্তিগুলোয়ও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় (হাসান, ২০২২)। শহরের টেকসই বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম অবদান রাখতে পারে, একটি টেকসই মডেল তৈরি করার মাধ্যমে যেখানে লোকেরা কাজের কাছাকাছি নিয়ে আসে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, সেই সঙ্গে স্মার্ট শহর এবং আরও ভালো অবকাঠামোর মাধ্যমে উদ্ভাবন এবং নতুন ধারণার উত্থানের অনুমতি তৈরি করে। কিন্তু শহুরে অঞ্চলগুলো খুব উন্নত, যার অর্থ ঘর, বাণিজ্যিক ভবন, রাস্তা, সেতু এবং রেলপথের মতো মানব কাঠামোর ঘনত্ব রয়েছে। ফলে 'শহুরে এলাকা' শহর এবং শহরতলির উল্লেখ করতে পারে। গণমাধ্যম শহর বা নগরায়ণের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। এই আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন এবং একটি সমাজ বা শহর গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর একটি টেকসই শহর হলো একটি শহুরের কেন্দ্র, যা নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব উন্নত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে (চৌধুরী, ২০২২)।

> গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষকেই নাগরিক হিসাবে তাদের চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। গণমাধ্যম সেসব কর্ম, সমস্যা ও দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে এবং বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সমাধানকল্পে জনমতও গঠন করে থাকে

উন্নয়ন ও গণমাধ্যম

গণমাধ্যম মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রেক্ষাপটে মিডিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফল বদলে দিতে পারে। যেমন: বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে স্বাধীনতার উষালগ্ন পর্যন্ত জাতীয় জাগরণে জনগণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল তখনকার প্রায় সব প্রিন্ট মিডিয়া (মিত্র, ২০১৯)। জনগণ ও গণমাধ্যমের এমন অবিভাজ্য ঘনিষ্ঠতা বাঙালির ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। তখন নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর মালিকানা ছিল সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের হাতে। তবে আজ মালিকানা যাদের হাতেই থাক, নাগরিক শ্রেণির মতামত প্রকাশে বর্তমানের মিডিয়াগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে, যা এর প্রশংসিত দিক। তবে স্বাধীন দেশে মিডিয়া কতটুকু জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে, তা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর মুক্ত গণমাধ্যম একে অন্যের পরিপূরক। দুটিই একে অন্যকে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে মিডিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতার প্রারম্ভিক কয়েক বছর পর পুনরায় মিডিয়া বিকশিত হতে শুরু করে ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর থেকে (আলম, ২০২১)। অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও ব্যক্তি খাতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল। বিগত দশকে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশন ও এফএম রেডিয়োর সূচনার মাধ্যমে মিডিয়ার ল্যান্ডস্ক্যাপ বা ভূমিতলের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যাদের সংবাদপত্র বা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সুবিধা নেই, তারা এখন এফএম রেডিয়োর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সংবাদ জানতে পারছে (রহমান, ২০১৯)।

উইলবার শ্রামের মতে, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–এক. অবহিত করা, দুই. নির্দেশ দেওয়া এবং তিন. অংশগ্রহণ করা। অবহিত করা হলো সমাজের উন্নয়নের জন্য সঠিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব প্রধান মানদণ্ড (আব্রাহাম ও খুসবো, ২০২২)। বিশ্বায়ন ও অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমের কোনো না কোনো ভূমিকা রয়েছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে প্রযুক্তি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিকাশ গণমাধ্যমের মাধ্যমে হয়েছে। জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব গণমাধ্যমের। জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা বিকাশেও মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যম সরকারসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমালোচনা করে তাদের আরও সংশোধনের সুযোগ তৈরি করে দেয়। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে গণমাধ্যমকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে যে প্রদীপশিখাটি জ্বলতে থাকে, তা হলো গণমাধ্যম।

উন্নয়নের কথা বলতে গেলেই গণমাধ্যমের প্রসঙ্গ আসবে। উন্নয়ন ও গণমাধ্যম, এ দুটি শব্দের উপস্থিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অপরটি ছাড়া ভারসাম্যহীন। উন্নয়নে গণমাধ্যমের বহুমাত্রিক ভূমিকা এবং গণমাধ্যম ও উন্নয়ন পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত সুনিবিড় (পারভীন, ২০১৫)। শক্তিশালী গণমাধ্যম রাষ্ট্রযন্ত্রকে সঠিকভাবে পরিচালনার চালিকাশক্তি। গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা, অর্জন, চাহিদা, জনমত সৃষ্টি ও সমাজের ভালো-মন্দ প্রতিফলিত হয়। গণমাধ্যমকে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রতিনিধি বলা চলে। মানবজীবন ও সমাজ উন্নয়নের একমাত্র মাধ্যম হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যম দ্বারা সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন সাংবাদিক। আর উপজেলা পর্যায়ে একজন সংবাদকর্মীর চোখ থাকে সমাজের ঘটে যাওয়া একেবারে পিন থেকে কামান, ছোটো থেকে বড়ো, ভালো-মন্দ, সমস্যা-সম্ভাবনা সবকিছুতে। একজন সাংবাদিক নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে রাতদিন জীবনের সোনালি সময় ব্যয় করে গণমানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনার খোঁজে কান পেতে থাকেন। দিনের শেষে তার পাঠানো সংবাদ পরদিন পত্রিকার পাতায় পাঠক হাতে পেলে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটে (রহমান, ২০১৯)।

একজন নির্ভীক সংবাদকর্মী হলেন সমাজের নির্মাতা। তিনি গণমানুষের চাহিদা ও স্বপ্নকে জাগিয়ে তোলার পর সরকার তা বাস্তবায়ন করে। অবহেলিত জনপদের খবর লেখনীর মাধ্যমে সভ্যতার উচ্চতায় নিতে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ভূমিকার বিকল্প নেই। গণমাধ্যম সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে। সুবিধাবঞ্চিত জনপদের নাগরিকদের আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করে। একমাত্র গণমাধ্যম পারে মানুষকে নতুন নতুন চিন্তা, ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তথ্য সরবরাহ করে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। আজকের যুগে গণমাধ্যম শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, লাইফ স্টাইল, রেসিপি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, আইসিটি, চাষাবাদ, ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় সব চাহিদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে (হক ও আহম্মদ, ২০১৭)। নানা সীমাবদ্ধতা আর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও গণমাধ্যম সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করছে। সাধারণ মানুষ ও গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে দেশে গণমাধ্যম স্বাধীন-শক্তিশালী, সেই দেশে গণতন্ত্র উন্নত এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত। একটি জনপদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি মূল্যায়নের সার্বিক মাপকাঠি হলো উন্নয়ন। তবে গণমাধ্যমের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অর্জনের পেছনে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গণমাধ্যমে শহরের উন্নয়নমূলক বার্তা

গণমাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলেই শহরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। যেসব বিষয় যেমন: রাজনৈতিক বিবেচনায় গড়ে ওঠা পৌরসভা কেমন চলছে, সেখানে কেমন সেবা পাওয়া যায়, মেয়র ও কাউন্সিলের ভূমিকা, কেনাকাটায় বা দরপত্রে অনিয়ম, অর্থ তহবিলের উৎস ও ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি প্রভৃতি সম্পর্কেও শহরের জনসাধারণ ছিল অবহেলিত ও অজ্ঞ। গণমাধ্যম সেসব বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন করার ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শহরের উন্নয়ন নিশ্চিত করছে। নিম্নে শহর উন্নয়নের জন্য গণমাধ্যম কোন কোন ক্ষেত্রে বার্তা দেয়, তা আলোচনা করা হলো:

এক. শিক্ষার সম্প্রসারণ

শহরের অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যম অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহরের স্কুলগুলোয় ভালো শিক্ষক থাকায় শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে। আমাদের দেশের প্রায় সবকটি পত্রিকায় শিক্ষার জন্য একটি আলাদা বিভাগ থাকে। এই বিভাগে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য ছাপানোর মাধ্যমে শহরের মানুষকে শিক্ষিত করা যায়। এছাড়াও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে শহরের মানুষকে শিক্ষিত করে শহরের উন্নয়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষাসহ দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি খবরাখবর শহরের জনগণ গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পারে।

দুই. অর্থনৈতিক অগ্রগতি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন কর্মসূচি, নীতি বা কার্যকলাপ, যা একটি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মঙ্গল এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করাকে বোঝায়। 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন'-এর অর্থ কী, তা নির্ভর করবে আপনি যে সম্প্রদায়ে বাস করছেন তার ওপর। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সুযোগ, চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রাধিকার রয়েছে। শহরের অর্থনীতিতেও গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ভারী ও মাঝারি শিল্প, বুটিক, রেডিমেট গার্মেন্ট, হোটেল ও মোটেল, শেয়ারবাজার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক তথ্য এবং বিভিন্ন পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর নিয়ে তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করে।

তিন. জননীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত তথ্য

দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ কর্মসূচি প্রভৃতির জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের নগর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কিন্তু দেখা যায়, শহরের অনেক জনগণ এসব কর্মসূচির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে শহরের জনগণ এসব কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারে। আবার তাদের মতামত পেশ করতে পারে।

চার. আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য

শহরের অনেক জনগণ বিভিন্ন তথ্য ও অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এর মধ্যে একটি অন্যতম তথ্য হলো আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এই ধরনের তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে শহরের বিভিন্ন অন্যায়, শোষণ, বাল্যবিবাহ, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রভৃতি হ্রাস পাচ্ছে। শহরের জনগণ অন্যায়ের প্রতিরোধ ও নিজেদের অধিকার আদায়ে সর্বদা সোচ্চার হচ্ছে।

পাঁচ. স্বাস্থ্য বার্তা প্রদান

শহরের কিছু মানুষ তাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাছাড়া শহরের বস্তিতে থাকা ও ছিন্নমূল অনেক মানুষ দারিদ্র্যের কারণে এবং উপযুক্ত চিকিৎসাব্যবস্থার অভাবে তারা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। গণমাধ্যম এই ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও সচেতনতামূলক ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন: সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য কুশল পাতায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর বা তথ্য প্রকাশ করে শহরের জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে। টিভি, রেডিয়ো প্রভৃতিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে শহরের জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে।

ছয়. রাজনৈতিক বার্তা

গণমাধ্যমগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রাজনৈতিক খবরাখবর ছাপানো ও প্রচারের মাধ্যমে শহরের জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। তরুণ, নারী, রাজনীতিবিদ ও বয়স্ক লোকেরাও সুযোগ পেলেই চায়ের দোকান, বাজার, পার্ক ও খেলার মাঠে রাজনৈতিক আলোচনা ও সমালোচনায় মেতে ওঠেন।

সাত. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র

দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় শহরে বেকারের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যমগুলো শহরের শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। গণমাধ্যমগুলোয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রমিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যার মাধ্যমে শহর ও গ্রামের শিক্ষিত যুবক ও শ্রমিকরা চাকরি করার সুযোগ পান। আর বেকার সমস্যার সমাধান করে শহরের সমাজের উন্নয়ন করতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আট. ব্যাবসাবাণিজ্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান

শহরের জনগণ ই-কমার্সের অধীনে তাদের পণ্য যেমন: কুটির ও হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, বুটিক হাউজ প্রভৃতি সামগ্রী শুধু দেশে নয়, বিদেশেও বাজারজাত করতে পারে। আগে দেখা গেছে, জনগণ তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেত না। কিন্তু গণমাধ্যমের মাধ্যমে বর্তমানে পণ্যের সঠিক মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। মুক্তবাণিজ্যের এদিনে যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ না করা যায়, তাহলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। গণমাধ্যমের ফলে শহর অঞ্চলের মানুষ বিশ্ব বাণিজ্য ও বিশ্ব পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী সময়ে সঠিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছে।

নয়. নারীর অধিকার

শহরের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিককালে নারী বিশেষ করে শহর অঞ্চলে তাদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি সচেতন। এর কারণ হিসাবে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। কৃষি ও শিক্ষার মতো গণমাধ্যমগুলো নারীদের জন্য আলাদা বিভাগ চালু করেছে, যেখানে নারীর অধিকার, স্বাবলম্বিতা অর্জনের উপায়, উন্নত জীবনযাপনের পদ্ধতি, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি সম্পর্কে ফিচার, রচনা, পরামর্শ প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। ফলে দেশের শহর এলাকার নারীরা তা জেনে স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্যোগ নেন, যা শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দশ. বিনোদনের ক্ষেত্র

বিনোদনের ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রেডিয়ো, টেলিভিশনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এছাড়া ক্রিকেট, ফুটবল খেলাও প্রচার করা হয়, যা জনগণের অবসর সময়ে মনের খোরাক জোগায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলে।

এগারো. পরিবেশবিষয়ক বার্তা প্রকাশ

শহরের উন্নয়নে আমাদের চারপাশের পরিবেশ সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। যেসব উপাদান (যেমন: কলকারখানার বর্জ্য, ই-বর্জ্য, ধূলিবালি, যানবাহনের ধোঁয়া প্রভৃতি) আমাদের পরিবেশ দূষিত করে, সেগুলোর কুফল সম্পর্কে গণমাধ্যম আমাদের সতর্কতামূলক বার্তা দেয়।

বারো. প্রযুক্তির হস্তান্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে এনে দিয়েছে নতুন প্রাণের ছোঁয়া। গণমাধ্যম এসব প্রযুক্তি প্রচার ও প্রচারণার ফলে প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার শহরের প্রত্যেকের কাছে পরিচিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে তারা প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির ব্যবহারে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নয়নের অগ্রগতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শহরের উন্নয়নমূলক বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার প্রতিবন্ধকতা

সাংবাদিকতায় শুধু শহরের উন্নয়নমূলক সংবাদ ও অনুষ্ঠানের গুণগতমান এবং পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, তা নয়; বরং এই সংকট আবর্তিত হয় বাংলাদেশ তো বটেই, সারা বিশ্বেই। এ সংকট কখনো কম, কখনো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। গণমাধ্যম জাতীয় ও শহরের উন্নয়নে যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, তা আমাদের বিভিন্ন জাতীয় অর্জনের দিকে তাকালে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কারণ, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই (আহম্মেদ, ২০১৭)। বর্তমানে সমাজদেহে যে বোধের জায়গা তৈরি হচ্ছে, এর পেছনে গণমাধ্যমের ভূমিকাই প্রধান। গণমাধ্যম সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে থাকে। গণমাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই সরকার ও জনগণের মধ্যে জনগণ কী ভাবছে, সরকার কী করছে, তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব না। আজ মিডিয়া বা গণমাধ্যমের কল্যাণে পুরো পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা একে অন্যের জীবনযাত্রা, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারছি ঠিকই; কিন্তু সে অবস্থাটি বর্তমানে অনেকটা কমে এসেছে। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুবিধ নতুন প্রতিপক্ষ, যারা মুক্ত-স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করার ক্ষমতা রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধে আবদ্ধ রাখে। এসব প্রতিপক্ষ কখনো এক. গণতান্ত্রিক আবরণে অগণতান্ত্রিক মানসিকতার কিছু কিছু শাসক, দুই. ক্ষমতার অবৈধ দখলদার, তিন. প্রভাবশালী করপোরেট পুঁজি বা বড়ো পুঁজি, চার. সুসংঘবদ্ধ চোরাচালানচক্র, পাঁচ. উগ্রবাদী বা অসহিষ্ণু আদর্শবাদী, ছয়. আবার উগ্রবাণিজ্যবাদী, সাত. সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের অবমূল্যায়ন বা মালিকের সম্পাদকরূপে আবির্ভাবও মুক্ত স্বাধীন সাংবাদিকতার চরম প্রতিপক্ষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, আট. পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে বেসামরিক প্রশাসনের বাইরে বিশেষ গোষ্ঠীর দাপট, নয়. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, দশ. সাংবাদিকতার নামে অপসাংবাদিকতা, কায়েমি স্বার্থে সংবাদ পরিবেশন অথবা পরিবেশন না করা এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া এখন সবচেয়ে বড়ো সংকট। এসব নানামুখী বাধা শহরের উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার টুঁটি চেপে ধরতে চায়। গণমাধ্যমকর্মীদের নিজেদেরই ব্যক্তিগতভাবে, প্রতিষ্ঠানগতভাবে এবং সাংগঠনিকভাবেই সততা, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা নিয়ে সংগ্রাম করেই উন্নয়নের বার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্রের মৌলিক চাহিদাগুলোর উন্নয়নসহ এক্ষেত্রে গণসচেতনতা সৃষ্টি বিশেষভাবে জরুরি। সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে জনগণের সেই চাহিদা পূরণে কাজ করছে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা, নগর ও পল্লি-উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেলওয়ে, নৌ ও বিমান যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার, পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক বাণিজ্য, জনপ্রশাসন, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি রোধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, গণতন্ত্র-গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, লক্ষ্য-চেতনা সমাজ ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। ইন্টারনেট আজ জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের জীবনযাপন, তথ্য আদান-প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকার পরিচালনা, ব্যাবসাবাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম ইন্টারনেট। এমনকি নিউজ পোর্টাল, নিউজ ব্লক, আইপি টিভি, ইন্টারনেট রেডিয়ো প্রভৃতি ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন গণমাধ্যমগুলোও এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। গণমাধ্যমকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় এনে দেশকে ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশের কাতারে দাঁড় করাতে সবাইকে একত্রে এগিয়ে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. Matani, M. Hasanpoor, M. (2014). Studzing the role of mass media in improving governmental organizations' accountability. Journal of researcher (management), 11(34), 59-72.

২. Hasan. Muhammad Rashidul (2022), Urban planning in Bangladesh: Challenges and opportunities, The Business Standard

৩. Abraham. Albert and Khatra. Khushboo (2022) Media and Urban Governance: The Quest for Sustainable Cities and Communities, The Electrochemical Society, ECS Transactions, Volume 107, Number 1

৪. আলম, ড. শামসুল (২০২১) ব্যবসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিবর্তন, মানবকণ্ঠ

৫. রহমান, সতীর্থ (২০১৯) মান উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা, প্রতিদিনের সংবাদ

৬. চুপ্পু, মো. সাহাবুদ্দিন (২০২২), বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নেপথ্যে, দৈনিক জনকণ্ঠ

৭. ফরাসউদ্দিন, ড. মোহাম্মদ (২০২২) উন্নয়নে বাংলাদেশ, যুগান্তর ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুল (২০২১) বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান, যায়যায়দিন

৮. চৌধুরী, পরীক্ষিত (২০২১) টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন সরকার ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সহায়তা, যুগান্তর

৯. আহম্মেদ, ড. নিয়াজ (২০১৭) গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা, কালের কণ্ঠ

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিভাগ
নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী

স্থানীয় সরকার ও মফস্‌সল সাংবাদিকতা

মামুন অর রশিদ

স্থানীয় সরকার ও মফস্‌সল সাংবাদিকতা গণমাধ্যমের আধেয়ের একটি বিরাট জায়গা দখল করে আছে। স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে। ছোটো ছোটো এলাকাভিত্তিক স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ সরকার গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদের যথাযথভাবে বিভিন্ন সেবা দিতে পারে। বিস্তারিত বলতে গেলে, স্থানীয় সরকার হলো শাসনব্যবস্থার নিম্নতম পর্যায়ের বা স্থানীয়ভাবে সংগঠিত সরকারব্যবস্থা। আমাদের এই বাংলায় সব যুগেই স্থানীয় সরকার ছিল; তবে যুগে যুগে এর ধরন ছিল ভিন্নতর। গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানই স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তুলেছিল, আর এ প্রতিষ্ঠানের ওপরই মূলত নির্ভরশীল ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সরকারব্যবস্থা। গ্রামীণ সমাজ নিজ নিজ শাসনকার্য পরিচালনা করত। রাজা খাজনা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল, যেমন: গ্রামপ্রধান, গ্রাম পরিষদ প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে দুই ধরনের উদ্দেশ্য ছিল–একদিকে রাজস্ব আদায় এবং অন্যদিকে উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত করা, রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা। সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ, গ্রামিকা অথবা গ্রামপাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্থানীয় প্রশাসনের প্রকৃতি কেমন ছিল, এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণাদি নেই। খুব সম্ভবত গ্রাম পর্যায়ের

ঊর্ধ্বতন স্তরে কেন্দ্রীয় শাসন সম্প্রসারিত ছিল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ছিল না। আর সেখানে সামাজিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে একধরনের স্থানীয় পরামর্শকব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা জনগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকারের দাবি সব সময়ই পরস্পরকে গতিময় করে। গণতান্ত্রিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরতে পারে। নির্বাচিত প্রশাসনের সঙ্গে প্রতিটি স্তরের প্রশাসনে স্থানীয় সরকার সংস্থার সংযোগ স্থাপন করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০-এ একটি স্থানীয় সরকারের আউটলাইন রয়েছে, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা বর্ণনা করে যাতে প্রশাসন প্রতিটি ইউনিটের জন্য জনগণকে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করাতে পারে। সাংবিধানিক প্রয়োজনের অনুপাতে এবং সব অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক।

স্থানীয় সরকারের প্রধান কার্যাবলি ও দায়িত্ব-কর্তব্য

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত বিষয়গুলো।
২. স্থানীয় সরকার ও গ্রাম প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন।
৩. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের (এনআইএলজি) প্রশাসন এবং উপরিউক্ত সংস্থার দ্বারা পরিচালিত সব প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।
৪. বিএসএস (পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং)-এর প্রশাসন।
৫. সুপেয় পানিসংক্রান্ত বিষয়।
৬. গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা উন্নয়ন।
৭. (ক) সময়মতো সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সেতু এবং কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামের সড়কগুলোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
(খ) উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলসম্পদ প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
৮. গ্রামীণ পুলিশসংক্রান্ত বিষয়াবলি।
৯. দাফন কার্যক্রম ও কবরস্থান, শবদাহ কার্যক্রম ও শ্মশান ঘাট।
১০. গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ।
১১. ডাকবাংলো এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর রেস্টহাউজ।
১২. স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে পাবলিক পার্ক ও বৃক্ষগুল্মাদি।
১৩. আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন।
১৪. এই বিভাগের অধীন অফিস ও সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ।
১৫. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ এবং এই বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয় সম্পর্কিত দেশ ও বিশ্ব সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংবিধান ও চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি।
১৬. এই বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ের সব আইন এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান।
১৭. আদালতে জারি করা ফি ছাড়া এই বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে ফি।

এখন স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক। স্থানীয় সরকারের কার্যাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে যেসব বিষয়-আশয় আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, এর আলোকে সংবাদ রচনা ও গণমাধ্যমে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের ব্যবস্থাই হচ্ছে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা। স্থানীয় সরকার নিয়ে লেখালেখি আজকাল আর নতুন কোনো বিষয় নয়।

সাংবাদিকতা পেশা এমনিতেই চ্যালেঞ্জের। তার ওপর আবার মফস্সল সাংবাদিকতা। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয় সাংবাদিকতায়। বিভিন্ন প্রকার হুমকি, মামলা-হামলার শিকার হতে হয় যে পেশায়, সেটাই হলো সাংবাদিকতা। তবে ঝুঁকি থাকলেও অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা এটি। সাংবাদিকদের সমাজের দর্পণ বা আয়না বলা হয়। জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। একটি সংবাদ তৈরি করতে হলে ছুটতে হয় একেবারে তৃণমূলে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় মফস্সল সাংবাদিকদের। দুর্নীতি, অনিয়মের সংবাদ তৈরি করতে হুমকি বা হামলা হয়। জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন বা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সংবাদ হলেই অবস্থা কিছুটা অন্যরকম হয়। মফস্সল এলাকায় সাংবাদিকদের তেমন নিরাপত্তা দেওয়ারও কেউ থাকে না। অনেক সময় মামলা হয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটে, যেমন: পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আগে কোনো বিরোধ থাকলে তুচ্ছ কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাতকড়াও পরানো হয়। সাংবাদিকদের জন্য চরম লজ্জাজনক বিষয় এটা। সারা দিন ছুটতে হয় সংবাদের জন্য। উপজেলা পরিষদ, পৌর পরিষদ, থানা, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটতে হয় মফস্সল সাংবাদিকদের।

আর এমনিতেই তো মফস্সল সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। এটা দেশের সব শ্রেণির জনগণই জানে। একপ্রকার যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে হয় মফস্সল সাংবাদিকদের। স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতার সঙ্গে কতগুলো পক্ষ সম্পৃক্ত, যেমন: ১. সাংবাদিক, ২. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ৩. প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি, ৪. সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, ৫. ভুক্তভোগী, ৬. অপরাধী চক্র, ৭. প্রভাবক ও ৮. আমজনতা।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ঘটে যাওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ঘটনাবলির সরেজমিন প্রতিবেদন: আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের যে কার্যক্রম চলমান, তাতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মফস্সল সাংবাদিকতার অবদানও কম নয়। প্রতিনিয়ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিটি জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধি তার কর্ম-এলাকার অবহেলিত, উন্নয়নবঞ্চিত জনপদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। খুন, ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, অশিক্ষা, অপচিকিৎসা, যৌতুক, গ্রামের সরল মানুষের নানাভাবে প্রতারিত হওয়া, জবরদখল, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলাদলি, অগ্নিকাণ্ড, পাহাড়ধস, লোডশেডিং প্রভৃতির শিকার হওয়া মানুষের পক্ষে কথা বলেন।

দুর্ঘটনা, উন্নয়ন, অনিয়ম, খেলাধুলা, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। পত্রিকার অফিসগুলোয় বিভাগভিত্তিক আলাদা আলাদা রিপোর্টার থাকলেও মফস্সল সাংবাদিকদের মধ্যে কোনো বিভাগ ভাগ করা নেই, তাই তাদের প্রতিটি বিষয়েই সংবাদ ও প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। মফস্সল সাংবাদিকরা চতুর্মুখী যে শ্রম দেন, এর বিনিময়ে তাঁরা তেমন কিছুই পান না।

যাঁরা সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে বেতনভাতা পান, তাঁদের বেতনভাতা বৃদ্ধি এবং যাঁদের বেতনভুক্ত করা হয়নি, তাঁদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক হওয়া উচিত। এর ফলে অপসাংবাদিকতা রোধ করা সম্ভব হবে। মফস্সল সাংবাদিকদের জীবিকানির্বাহের পাশাপাশি সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনসাধন মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত। সুতরাং তাদেরকে নিবেদিতপ্রাণ, পরিশ্রমী, সময়ানুবর্তী, সাহসী, কৌতূহলী, বুদ্ধিদীপ্ত, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দলনিরপেক্ষ, সৎ, ধৈর্যশীল এবং রস ও সাহিত্যবোধসম্পন্ন হতে হবে। গ্রামবাংলার কল্যাণে মফস্সল সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। তাই গ্রামীণ তথা মফস্সল সাংবাদিকদের উপেক্ষা করে কোনো সংবাদপত্রই সফল অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু যেসব মফস্সল সাংবাদিক দেশের ৮৫ ভাগ মানুষের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অভাব-অভিযোগের খবর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে পত্রিকায় পাঠিয়ে থাকেন; আবার এমন কিছু সংবাদ আছে, যা সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় প্রশাসনের পরোক্ষ হুমকি, প্রভাবশালীদের চোখ রাঙানি, এমনকি প্রাণনাশের মতো আশঙ্কাও থাকে–তারপরও থেমে থাকেনি মফস্সল সাংবাদিকের পথচলা। তবে এখন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন হয়েছে নিঃসন্দেহে।

বেশ কয়েক বছর আগেও মফস্সল সাংবাদিককে সংবাদ পাঠাতে কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হতো ফ্যাক্স করার জন্য। এখন হাতের মুঠোয় সব যোগাযোগ। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে সাংবাদিকতা অনেক সহজ হয়েছে। কদর বেড়েছে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের। বর্তমানে সাংবাদিকতার ধরন পালটেছে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে। এখন আর প্রিন্ট হওয়া সংবাদপত্রের খবরের জন্য কেউ বসে থাকে না। মানুষ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিভিন্ন অনলাইন সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো মুহূর্তেই পেয়ে যাচ্ছেন।

এখন সময় এসেছে স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতার পরিশীলিত চর্চার। যদিও এটি সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা-চ্যালেঞ্জ। সেগুলো উত্তরণ ঘটিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

১. গণমাধ্যমের জন্য তথ্য সংগ্রহে সমস্যা। প্রায়ই দেখা যায়, বিভিন্ন ইউনিয়ন তথ্যসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হলেও সেখানে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি কাজের স্বচ্ছ তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, মেম্বার, পিআইও-এর দ্বারস্থ হলেও তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পাওয়াই যায় না। আর পাওয়া গেলেও তা হয় আংশিক, খণ্ডিত তথ্য। এ বিষয়ে জবাবদিহির জায়গাটি আরও পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদেরই। খুঁজে বের করতে হবে সত্য ঘটনা।

২. এ কথা প্রায়ই শোনা যায়, স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকরা সুপ্রশিক্ষিত এবং দক্ষ নন। তারা ইনডেপথ রিপোর্টিং সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন না। সংবাদ লেখা ও সম্পাদনার বিষয়েও তাদের প্রশিক্ষণের অভাব থাকে। স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের সেই প্রশিক্ষণ না থাকায় তাঁরা বিষয়গুলোকে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারেন না। এজন্য এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

৩. বিভিন্ন সময় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার তথ্য সংগ্রহে গেলে হামলা-মামলার শিকার হতে হয়। এটি স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য একটি বড়ো সমস্যা হিসাবে দেখা হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪. মফস্সল সাংবাদিকদের একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, তাঁদের স্থানীয় সরকারবিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা সময়ই অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যেজন্য তাঁদের আগ্রহের মাত্রা বেশি একটা থাকে না। আবার কোনো কোনো গণমাধ্যমে স্থানীয় সরকারবিষয়ক প্রতিবেদনটি প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচারের নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ, সংবাদপত্র, সম্প্রচার বা অনলাইন–যে মাধ্যমের কথাই বলি না কেন, কর্তৃপক্ষের পলিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখনো স্থানীয় সরকার বিট নির্ধারণ নিশ্চিত হয়নি। ফলে এ ধরনের লেখা এখনো কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এ বিষয়েও পলিসিগত আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে। এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে হবে।

মফস্সল সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সাংবাদিক বের করে আনেন খবরের ভেতরের খবর। এ কারণে সংবাদপত্রগুলো এখন মফস্সল সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর বাইরের খবরে আজকাল বৈচিত্র্য এসেছে। মফস্সল সাংবাদিকরা বিভিন্ন বিষয়েও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন। সাংবাদিকদের এ সুযোগ সৃষ্টি করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। আশা করি, পিআইবি এই ধারা অব্যাহত রেখে তাদের কর্মপরিবেশ আরও প্রসারিত করবে। বর্তমানে পিআইবি পরিচালিত অনলাইনে ঘরে বসে সাংবাদিকতার বেশকিছু কোর্স মফস্সল সাংবাদিকদের অনেক উপকারে এসেছে। রাজধানী এবং বিভাগীয় শহরগুলোর বাইরেও আজকাল জেলা শহরগুলো থেকে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাদের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এরা মূলত পাঠকনির্ভর নিজ শহরে ও আশপাশের মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছে। সরকার ও জনগণের সচেতনতা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন প্রকৃত সাংবাদিকদের নীতিবোধ ও সৎ মানসিকতা। পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন।

তথ্যসূত্র

* আবুল বাশার শেখ (২০২০) সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা এবং মফস্বল সাংবাদিকতা, দৈনিক সোনালী নিউজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০, https://www.sonalinews.com/opinion/news/117043
* আবু জাফর সিদ্দিকী (২০২০), মফস্বল সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং পেশা, যায়যায়দিন, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০, https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/editorial/87752/ মফস্বল-সাংবাদিকতা-চ্যালেঞ্জিং-পেশা
* সিকান্দার ফয়েজ (২০২২) স্থানীয় সরকার সাংবাদিকতা: সমস্যা ও সম্ভাবনা, সংবাদ সারা বেলা, ২২ অক্টোবর ২০২২, https://www.sangbadsara-bela.com/editorial/article/23657/স্থানীয়-সরকার-সাংবাদিকতা-সমস্যা-ও-সম্ভাবনা
* http://www.lgd.gov.bd/

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

নগর ও নগরসেবা সংক্রান্ত সাংবাদিকতার শুরুর কথা

মিনহাজ উদ্দীন

গণমাধ্যম ধারণাটির সূচনা সংবাদপত্রের মাধ্যমে। আর সংবাদপত্র নিশ্চিতভাবেই নগর সভ্যতার অবদান। নগরেই সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। নগরকেন্দ্রিক সংবাদপত্রের বিকাশের কথা বলতে হলে আমাদের একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে। শুধু সংবাদপত্রই নয়, পুরো বিশ্বসভ্যতায় বড়ো ধরনের এক পরিবর্তন এনেছিলেন জার্মান উদ্ভাবক জোহানেস জেনসফিচ গুটেনবার্গ (১৩৯০-১৪৬৮)। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন স্থানান্তরযোগ্য ছাপাখানা। সময়টি ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক। জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলীয় মেইনৎস শহরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি আবিষ্কার করেন এই আশ্চর্য যন্ত্র, যা বিশ্বসভ্যতার গতিপথই পরিবর্তন করে দেয়। জাদুকরী এই যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম ছাপা হয় একটি বর্ষপঞ্জি। পরে ১৪৫৬ সালে ছাপানো হয় বাইবেল, যা গুটেনবার্গ বাইবেল নামে ইতিহাস বিখ্যাত। আবিষ্কারের পর গুটেনবার্গের এই যন্ত্রটি পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পর্তুগিজ পাদরিদের হাত ধরে এই যন্ত্র ভারতবর্ষেও চলে আসে। যাই হোক, ছাপাযন্ত্রের বিকাশের পথ ধরে ১৭০২ সালের ১১ মার্চ প্রথম লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদপত্র। যার নাম ছিল দ্য ডেইলি কৌরান্ট (The Daily Courant)। এটি ছিল প্রথম ব্রিটিশ দৈনিক সংবাদপত্র। একই সঙ্গে আধুনিক কাঠামোর প্রথম গণমাধ্যম।

দ্য ডেইলি কৌরান্টের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রথমদিকে এতে প্রাধান্য পেত রাজকীয় নানা ফরমান ও লন্ডনভিত্তিক নানা সংবাদ। আর এসব সংবাদের অন্যতম বড়ো একটি উৎস ছিল লন্ডনের বন্দর। বন্দরে নাবিক ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অনেক দূরদূরান্তের সংবাদ আসত, যা প্রকাশিত হতো সংবাদপত্রের পাতায়। যদি আরও একটু পেছনে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে ৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সংবাদের একটা বড়ো উৎস ছিল রোম নগরী। তখন জুলিয়াস সিজারের রাজত্ব। তার রাজত্বে একধরনের লোক নিয়োজিত ছিলেন, যারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। যাদের বলা হতো সংবাদ লেখক (News writer)। এরপর এই সংবাদ লেখকদের জরুরি ও সময় উপযোগী সংবাদ রোমের জনাকীর্ণ স্থানের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হতো। যার নাম ছিল *একটা-ডাইউরনা* (Acta-diurna)। এই সংবাদেও প্রাধান্য পেত নগরের নানা ঘটনাপ্রবাহ। এছাড়া মিশরীয় সভ্যতায়ও এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের প্রচলন ছিল। তবে সেগুলোর বেশির ভাগই ছিল ঘোষণাকেন্দ্রিক। এবার আসা যাক ভারতীয় উপমহাদেশে। সবারই জানা, ভারতীয় উপমহাদেশের সমৃদ্ধ এক নগর কলকাতা। হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহরকে বলা হতো ভারতের সাংস্কৃতিক নগরী। ১৭৭৩ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই নগর ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ওই সময়ের মধ্যেই ১৭৮০ সালে ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রা শুরু একটি সংবাদপত্র। যার নাম বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভাইজার। যার সম্পাদক ছিলেন পাগলাটে, অনেকটা বিপ্লবী চরিত্রের জেমস অগাস্টাস হিকি। আইরিশ এই ব্যক্তিই ছিলেন সম্পাদক ও প্রকাশক। যে কারণে সংবাদপত্রটি হিকির গেজেট নামেও পরিচিতি পায়। ১৭৮০ সালের জানুয়ারিতে কলকাতার ৬৭ নম্বর রাধাবাজারে স্থাপিত হিকির ছাপাখানা থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয় বেঙ্গল গেজেট। চার পাতার সংবাদপত্র। দাম মাত্র এক টাকা। তবে বলে রাখা ভালো, বেঙ্গল গেজেটের আধেয় কিন্তু মানসম্মত ছিল না। ইংরেজ রাজ কর্মচারীদের ওপর হিকির প্রচণ্ড রাগ ছিল। তাই তার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে সাহেবদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা কেচ্ছা-কাহিনি। তাদের সমকামিতার ইঙ্গিতপূর্ণ নানা সংবাদও প্রকাশিত হয়। যেগুলোর বেশির ভাগেরই কোনো ভিত্তি ছিল না। তবে কলকাতা নগরের সংবাদও থাকত। শোভাবাজারের এক ধনী জুড়ি গাড়িচাপা দিল এক গরিবকে...কুড়ি টাকা দিয়ে কেসটা চাপা দেওয়া হয়েছে–এমন নানা চটকদার সংবাদ থাকত হিকির বেঙ্গল গেজেটে।

এছাড়া হিকির গেজেটে থাকত কলকাতা নগরীর নানা নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কথা। যেমন: ওই সময় ব্রিটিশরা কলকাতা নগরীতে ১৪ শতাংশ কর আরোপ করেছিল। হিকি তার সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, কলকাতা নগর প্রশাসনে ভারতীয় কোনো প্রতিনিধি নেই। কিন্তু তারপরও ভারতীয়দের ওপর ১৪ শতাংশ কর বসানোর অধিকার কী করে রাখে কোম্পানি? এ রকম নানা খবর থাকত হিকির সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে। তবে এটি বেশি দিন টেকেনি। মাত্র দুই বছরের মাথায় বন্ধ হয়ে যায় হিকির পত্রিকা বেঙ্গল গেজেট।

ডেইলি কৌরান্ট, একটা-ডাইউরনা অথবা হিকির বেঙ্গল গেজেট–এই তিনটি পথ রচনাকারী সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল নগরকে কেন্দ্র করে। নগরসভ্যতার আধেয় নিয়েই এই সংবাদপত্রগুলোর বিকাশ।

২০২২ সালের ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫০৪টি। আর সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ৩৪৪টি। যদিও এর বেশির ভাগই বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশনায় নেই। আর সবারই জানা, বর্তমানে সম্প্রচারে থাকা ৩০টির বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কেন্দ্রস্থলও রাজধানী ঢাকা। একই সঙ্গে প্রায় ৩০টি এফএম রেডিয়ো সম্প্রচার হচ্ছে ঢাকা থেকে। যদিও কিছু রেডিয়োর ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা শহরে বড়ো অফিস আছে। মোদ্দা কথা, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা নগরকেন্দ্রিক। আর যেহেতু রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র রাজধানী ঢাকা, তাই স্বাভাবিকভাবেই সংবাদের আধেয় ঢাকায় বেশি। এটা শুধু বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ক্ষেত্রেই নয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ব্রিটেন, চীন, জাপান–সব জায়গায়ই একই চিত্র। আর শহর বা নগরকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা বিকশিত হওয়ার কারণে অনেক প্রভাবশালী গণমাধ্যমের নামকরণও হয়েছে বিভিন্ন শহর বা নগরকেন্দ্রিক। যেমন: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, ব্যাংকক পোস্ট, দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট প্রভৃতি।

নগরসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতাও বিকশিত হয়েছে। নাগরিক জীবন, সেবা, নিরাপত্তা, অপরাধ, বিনোদন, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, খেলাধুলা থেকে শুরু করে নগরের সবকিছুই বর্তমান সময়ে নগরবিষয়ক সাংবাদিকতার আধেয় হতে পারে। আর এজন্যই সংবাদপত্রগুলোর নগর বা রাজধানীকেন্দ্রিক সংবাদকর্মী বা জনবল বেশি নিয়োগ করা থাকে।

তবে এখানে একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে কলকাতা থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত কিন্তু ঢাকা থেকে নয়। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল রংপুর থেকে। যার নাম ছিল রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ রায়। আর যদি রাজধানী ঢাকার কথা বলা হয়, তাহলে উল্লেখ করতে হবে ঢাকা নিউজ-এর কথা। এটি ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র। আর ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম ছিল ঢাকা প্রকাশ। যেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের আধেয় সম্পর্কে খুব একটা জানা না গেলেও ঢাকা নিউজ ও ঢাকা প্রকাশ সম্পর্কে জানা যায়, এই সংবাদপত্র দুটির আধেয় ছিল নগরকেন্দ্রিক। নগরিক জীবনের নানা সমস্যা আর আনন্দ-বেদনার ঘটনা স্থান পেত এই সংবাদপত্র দুটিতে।

তথ্যসূত্র

১. How To Write News For Broadcast and print Media (1973). David Dary. TAB BOOKS: USA.

২. রাজী, আর, ইসলাম, মঞ্জুরুল, এবং ইসলাম, নাঈমুল। (মে ১৯৯৭)। *সাংবাদিকতা: প্রথম পাঠ*। ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন।

৩. জেলে গেলেন সম্পাদক, লেখক; স্বাতী ভট্টাচার্য, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/a-brief-history-of-the-founder-of-first-newspaper-hicky-s-gazette-james-hicky-s-life-and-struggle-1.1045600

৪. https://www.library.illinois.edu/hpnl/tutorials/antebellum-newspapers-city/

৫. সারা দেশের নিবন্ধিত পত্রপত্রিকার পরিসংখ্যান\ file:///C:/Users/Hp/Desktop/2022-11-13-05-21-f4ed5da6ee8b7331d4b30cd8a2e47c17.pdf

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাম আদালত স্থানীয়দের জন্য ন্যায়বিচারের সহজ প্রবেশাধিকার

দীপক কুমার আচার্য

আসমা বেগম (৪২) বাস করেন লালমনিরহাট জেলার কুচলিবাড়ির এক দরিদ্র এলাকায়। দুই কন্যার মা আসমা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। গৃহকর্মী হিসাবে আসমা প্রতিদিন দুই ইউএস ডলারের (২০০ টাকা) কিছু বেশি আয় করেন এবং তার মালিকানাধীন একটি ছোটো জমি থেকে যে ফসল ফলে তা দিয়ে কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকেন।

তবে একটি ঘটনা আসমার জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। বিরোধের কারণে প্রতিবেশী শুধু ফসলের ক্ষতি করেনি, আসমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

তার শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন আসমা। মামলার দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পর্কে খুব কমই জানতেন তিনি। মামলার বিলম্ব তাকে ধীরে ধীরে আশাহত করে। একসময় জেলা আদালত মামলাটি কুচলিবাড়ির একটি গ্রাম আদালতে রেফার করে। শুরুতে আতঙ্কিত হলেও পরে আসমা এই গ্রাম্য আদালতের বিচারব্যবস্থাকে তার অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি সহজ এবং কার্যকর উপায় খুঁজে পান।

এ মামলায় আদালত আসমার পক্ষে রায় দিয়ে আসামিদের ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেন। ৪৮ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল

এবং আসমা এই প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'গ্রাম আদালতে আমি ন্যায্য বিচার পেয়েছি এবং প্রক্রিয়াটিও দ্রুত ছিল। আমি জেলা আদালতের তুলনায় সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছি। গ্রাম আদালত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার মামলা শেষ করেছে। আমার মামলাটি জেলা আদালতে নয় মাস সময় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছি। মামলাটি গ্রাম আদালতে স্থানান্তর না হলে আমি নিঃস্ব হয়ে যেতাম।'

আসমা এখন কাজে ফিরেছেন। তার এক মেয়ে পড়াশোনা করছে এবং তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে।

সিলেট জেলার টুকেরগাঁও ইউনিয়নের ফজর আলীর ছেলে আব্দুল জব্বার (৪১) বাদী হয়ে জালালাবাদ থানায় মো. সেলিম ও অন্য তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাকে মারধর করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন আদালতে হাজিরা দিয়ে অভিযোগকারী মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য টুকেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে রেফার করার আবেদন জানান। আদালত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য টুকেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদে পাঠান এবং টুকেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সাত দিনের মধ্যেই মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

এই মামলার মতো স্থানীয় নিম্ন আদালত থেকে চলতি বছর টুকেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে আরও দুটি মামলা পাঠানো হয়েছে।

টুকেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদ আহমেদ জানান, তারা দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অনুযায়ী এক বছরে গ্রাম আদালতে অন্তত ৫০টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন।

'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয় করা' একটি প্রকল্পের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ইউএনডিপি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে অংশীদারত্বে গ্রামীণ জনগণের জন্য ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেসের ফাঁক কমানোর জন্য একটি পাইলট উদ্যোগ হিসাবে ২০১১ সালে গ্রাম আদালত স্থাপন করে। গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার ৮৯১টি কেস করা হয়েছে।

গ্রাম আদালত এখন ১ হাজার ২০১টি ইউনিয়ন পরিষদে সক্রিয়, যা প্রায় ৭০ লাখ মানুষকে সহজ, স্বচ্ছ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিচারিক সেবা দেয়। নারীদের ন্যায়বিচারের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। মোট ৬৯ হাজার ৭২৭ জন মহিলা গ্রাম আদালতে বিচার চেয়েছেন। জেলা আদালতগুলো গ্রাম আদালতে প্রায় ১১ হাজার ৬১৪টি মামলা স্থানান্তর করেছে, যেটি শুধু জেলা পর্যায়ের আদালতগুলো গ্রাম আদালতের ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয় তা প্রদর্শন করে না, বরং বড়ো মামলা মোকাবিলা করার জন্য এবং অপেক্ষার সময় হ্রাস করার জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থাকে মুক্ত করতে সহায়তা করে। একজন দরিদ্র মহিলা যার মামলা জেলা আদালত থেকে গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়েছিল, তিনি গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

প্রকল্পটি নীতিগত পর্যায়েও বড়ো প্রভাব ফেলেছে। ইউএনডিপির সহায়তায় সরকার কর্তৃক গ্রাম আদালত আইন সংশোধন করা হয়। এটি গ্রাম আদালতের এখতিয়ার প্রসারিত করেছে এবং উদ্ভাবনী সংস্কার প্রবর্তন করেছে (আইনটি নারী ও শিশু সংক্রান্ত মামলায় প্যানেল সদস্য হিসাবে কমপক্ষে একজন মহিলার জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক করেছে)।

টুকেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদ আহমেদ বলেন, বিচারপ্রার্থীদের সিংহভাগই গ্রাম আদালতের প্রতি আস্থা রাখে এবং বিরোধে শতকরা ৮৫ ভাগ রায় মেনে চলে। তিনি বলেন, 'গ্রাম আদালতের ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যা সামাজিক সমস্যা এবং ছোটোখাটো অপরাধ হ্রাস থেকে স্পষ্ট।

'স্থানীয় জ্ঞান ও স্থানীয় ন্যায়বিচার আরও কার্যকর এবং সম্প্রদায়গুলো তাদের জীবনে সুবিধাগুলো দেখতে পারে। আমাদের আদালত সম্প্রদায়ভিত্তিক, সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সম্প্রদায়ের জন্য দ্রুত বিচার করে। আমাদের আইনজীবী এবং পুলিশ দরকার নেই এ আদালত চালানোর জন্য। আমরা আমাদের নিজেদের বিরোধ সমাধান করতে পারি,' তিনি যোগ করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন, গ্রাম আদালতের মামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িতদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ গ্রাম আদালত যেভাবে মামলা মোকাবিলা করেছে তাতে সন্তুষ্ট এবং গ্রাম আদালতের কারণে তাদের সমাজে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে।

এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং পরিদর্শন ও মূল্যায়ন শাখার মহাপরিচালক ড. মো. সারওয়ার বারী বলেন, 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয় করার তৃতীয় ধাপ শীঘ্রই শেষ হবে। ইতোমধ্যেই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) গ্রাম আদালতের চতুর্থ ধাপের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। তিনি বলেন, সারা দেশে গ্রাম আদালত চালু ও সক্রিয় করা গেলে বিচার বিভাগ মামলার জট থেকে মুক্তি পাবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত স্থাপন করা এবং সে কারণেই আমরা ইউএনডিপি ও ইইউকে সব ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। তারা আমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

গ্রাম আদালতগুলো সম্প্রদায়ের কাছে স্থানীয় ন্যায়বিচার আনার উপায় হিসাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলো সম্প্রদায়গুলোকে তাদের দোরগোড়ায় কম খরচে দ্রুত বিচার অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য–সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় ন্যায়বিচারের প্রতি আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলা এবং স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও দুর্বল গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

গ্রাম আদালত চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারে, আক্রমণের মাধ্যমে কাউকে আহত করা, দুই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে ছোটোখাটো সংঘর্ষ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ফৌজদারি অপরাধের বিচার করতে পারে।

এটি একটি জমির সীমানা এবং ফসল কাটা নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধের ফলে উদ্ভূত ছোটো সম্পত্তি বিরোধের বিচার করতে পারে। এতে কোনো আসামিকে জেল দেওয়া যাবে না। এটি ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।

গ্রাম আদালত পারিবারিক বিরোধ, দাম্পত্য সমস্যা, যৌতুকের অভিযোগ এবং চেক বাউন্স নিয়ে বিরোধ মোকাবিলা করতে পারে না। ব্যাংক ঋণ নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো এখতিয়ার নেই।

লেখক: সাংবাদিক

সূত্র থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে বড়ো খবর

রাজন ভট্টাচার্য

গত বছর হাওড় এলাকায় অকাল বন্যা ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে, তা বলার মতো নয়। গত ৫০ বছরে ভাটি বাংলার সাত জেলার মানুষ এত বড়ো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখেনি। দেখেনি হাওড়-নদীর এত রুদ্রমূর্তিও। ২০১৭ সালেও অকাল বন্যায় হাওড়ডুবিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদিও নিম্নাঞ্চলে এরকম ঘটনা নতুন নয়। কখনো কম, কখনো বেশি। স্থানীয় মানুষের কাছে রেওয়াজ আছে–প্রতি তিন বছর পর একবার ফসল পানিতে যায়।

২০২২ সালে সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জসহ গোটা ভাটি এলাকায় অকাল বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী করা হয়েছে অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মকে। হাওড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ বাঁধ নির্মাণসহ নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। যে বিভাগই কাজ করুক, বাস্তবায়ন হয় স্থানীয় সরকার বিভাগ বা এই বিভাগের জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই।

যেসব প্রকল্প ঘিরে অনিয়মের আঙুল তোলা হয়েছে, এর একটি নিয়েও অনুসন্ধানী কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। জনস্বার্থ বা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য এসব সংবাদ এড়িয়ে চলার কি কোনো সুযোগ আছে? তাছাড়া হাওড় এলাকা হলো সংবাদের ভান্ডার। যখন সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ আসে, তখন সাংবাদিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ ও দায়িত্ব দুটোই বেড়ে যায়। প্রকল্প ধরে একটু অনুসন্ধান

একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং সুষ্ঠুভাবে নাগরিক সেবা দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার ও নগর উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাবনায়ও বলা হয়েছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বের কথা। স্থানীয় সরকার ও নগর উন্নয়ন বিষয়টি বহুমাত্রিক। এটি একজন সাংবাদিকের সামনে সংবাদ প্রকাশে অনেক রাস্তা খুলে দেয়

করলেই বেরিয়ে আসতে পারে থলের বিড়াল, যা ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

হাওড়াঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের বিষয়টি নতুন করে আবারও সামনে আসে। প্রশ্ন হলো–কীভাবে অনিয়মের প্রমাণ করা যায়। একটি প্রকল্পে যদি শতকোটি টাকা বরাদ্দ থাকে, তাহলে কোন কোন খাতে সেই বরাদ্দ। এরপর কোন এলাকা থেকে মাটি আনা হয়েছে, কত দামে মাটি কেনা হলো, কত ট্রাকে মাটি আনা হয়েছে, কত লেবার কাজ করেছে আর ভাউচার কত টাকার হয়েছে–এসব দেখলেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। এজন্য সব তথ্যের দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যাবে না। মৌখিক অনেক প্রমাণ মিলবে সংবাদের বিভিন্ন উৎস থেকে।

অনেক সময় এসব তথ্য সংবাদের উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সব তথ্য আবার সংবাদ নয়। তথ্য হলো সংবাদের সূত্র, যা ধরে নিজ থেকে অনুসন্ধান করে প্রকৃত চিত্র বের করে আনা সম্ভব। যখন সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আনে, তখন সংবাদ সংগ্রহ করা বা তথ্য পাওয়া আরও সহজ। এক্ষেত্রে অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের তথ্য সরবরাহে সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক।

শুধু দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা সাংবাদিকের কাজ নয়। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন নিয়েও কাজ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে হাওড় এলাকাকে সংবাদের ক্ষেত্র হিসাবে চিন্তা করা হয়। কারণ, এসব এলাকার অনেক কিছুই খবরে ওঠে আসে না। নীরবে-নিভৃতে ভালো ভালো কাজ হচ্ছে, যা ধীরে ধীরে দুর্গত অঞ্চলের প্রকৃত চেহারা বদলে দিচ্ছে। ব্যাপক পরিবর্তন আনছে মানুষের জীবনযাত্রায়।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার সুখাইড় ইউনিয়ন যেতে একদিনের বেশি সময় লাগত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলে প্রায় ৩০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে সময় লাগত দুই দিন। দিনে একটি ট্রলার চলত। সময়মতো ট্রলার ধরতে না পারলে ভেঙে ভেঙে যাওয়া ছিল সত্যিই কষ্টসাধ্য। আর শুকনো মৌসুমে কখনো হেঁটে বা ছোটো ছোটো নৌকায় যেতে হতো। এখন তো বিশাল বিশাল রাস্তা হয়েছে। দিনে একাধিকবার নেত্রকোনা জেলা সদর থেকে সুখাইড় যাওয়া-আসা সম্ভব। তবে তিন থেকে চার কিলোমিটার জায়গা কিছুটা দুর্যোগপূর্ণ।

নেত্রকোনা থেকে জেলার দ্বীপ উপজেলা হিসাবে পরিচিত খালিয়াজুড়ির কথা যদি বলি, আজ থেকে ২০ বছর আগে সেখানে দিনে দিনে পৌঁছানো ছিল কষ্টসাধ্য। এখন শুকনো মৌসুমে অল্প সময়ে হাওড়ের বুক চিড়ে বয়ে চলা সড়কে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। ছোট্ট শহরে এখন গাড়িও চলে। বর্ষায়ও নৌকা বা ট্রলারের অভাব নেই।

খালিয়াজুড়ির বিশাল বিশাল নির্জন হাওড়ের মাঝ দিয়ে পাকা সড়ক হয়েছে, যা যুক্ত করেছে সুনামগঞ্জের শাল্লাসহ আশপাশের উপজেলাগুলোকে। হাওড়ের পারে গড়ে উঠেছে ভূমিহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প। যেখানে অসহায় পরিবারগুলোর মাথা গুঁজার ঠাঁই হয়েছে।

সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো–হাওড়ের হাটবাজারে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব নেই, যা প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে নীরবে সমাজ আলোকিত করে যাচ্ছে। হাওড় এলাকার 'গাভি' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। প্রত্যন্ত জনপদ হিসাবে পরিচিত। এই গ্রামে এখন ঘরে ঘরে এমএ পাশ। একই গ্রামে সচিব আছেন কয়েকজন জন। তারাই পুরো গ্রামের পরবর্তী প্রজন্মকে ভালো ভালো চাকরির সুবিধা করে দিয়ে পুরো অঞ্চলে আলো ছড়িয়েছেন।

নেত্রকোনার একটি বড়ো হাওড় হলো 'ডিঙ্গাপোতা'। বর্ষায় এই হাওড় সমুদ্রের মতো দেখতে মনে হয়। ঢেউ ভয় তোলে পারের মানুষদের মনেও। অথচ শুকনো মৌসুমে এই হাওড় পাড়ি দেওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। কারণ, বর্ষায় রাস্তা ডুবে থাকলেও হেমন্তে ভেসে ওঠে। তখন অটোরিকশা, মোটরসাইকেল, লেগুনা, ইজিবাইকের অভাব নেই। দুপারের মানুষ ইচ্ছামতো যাতায়াত করতে পারেন। যখন পানি আসে, তখন নৌযানের সংকট থাকে না।

এসব উন্নয়ন দুপারের মানুষের শত শত বছরের কঠিন জীবনযাত্রা সত্যিই বদলে দিয়েছে, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিটি জনপদের এমন চিত্র সংবাদ হয়ে উঠে আসতে পারে।

একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং সুষ্ঠুভাবে নাগরিক সেবা দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার ও নগর উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাবনায়ও বলা হয়েছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বের কথা। স্থানীয় সরকার ও নগর উন্নয়ন বিষয়টি বহুমাত্রিক। এটি একজন সাংবাদিকের সামনে সংবাদ প্রকাশে অনেক রাস্তা খুলে দেয়।

রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের বাইরে মফস্সলের সাংবাদিকতাও পর্যাপ্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন সমস্যা, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মফস্সল সাংবাদিকতা বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। মফস্সল শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'শহরবহির্ভূত স্থান' বা 'গ্রাম'। এই অর্থে মফস্সলের খবর মানে গ্রামের খবর; কিন্তু বাস্তবে ঢাকার বাইরে শহর, গ্রামগঞ্জ জনপদের খবরই মফস্সলের খবর। সুতরাং মফস্সল সাংবাদিকতা

বলতে রাজধানী ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মাত্রার সাংবাদিকতাকে বোঝানো হয়। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সংবাদ মফস্সল সাংবাদিকতার অন্যতম উপাদান হতে পারে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বর্তমান কাঠামোটির উদ্ভব ঘটে। উনিশ শতকের শেষভাগে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ফাংশন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় আজকের দিনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

ইতিহাসে এটি দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের আগে গ্রামগুলো স্বনির্ভরশীল ছিল। পঞ্চায়েত নামে পরিচিত প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন ছিল। গ্রামীণ সমাজের সব প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য এটি গঠন করেছেন। সামাজিক বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব ছিল।

স্বাধীনতার পরপর তিনটি স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং নারী সদস্যদের জন্য বিধি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। থানা পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৮২ সালে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালে চালু হওয়া উপজেলা পদ্ধতি ১৯৯১ সালে বিলুপ্ত হয়। শুরু থেকেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের এলাকার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাদের নিজস্ব আয়ের উৎস ছিল, তবুও তাদের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তারা প্রধানত সরকার থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন অনুদানের ওপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এলজিডি কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। এই বিভাগের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে এবং দারিদ্র্যবিমোচন উন্নয়নের জন্য সরকারি কর্মসূচির একটি অংশ হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) গ্রামাঞ্চলে এবং শহুরে উভয় এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যেমন: সেতুসহ সড়ক নির্মাণ, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন এবং কালভার্ট, ক্ষুদ্র পানিসম্পদ উন্নয়ন, বিকাশ কেন্দ্র, গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, বজ্রপাত রোধে আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বাস টার্মিনাল নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, পৌর বাজার নির্মাণ, বস্তি উন্নয়ন প্রভৃতি। পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্যে অবদান রাখার জন্য রাস্তার উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

শহর পর্যায়েও সিটি করপোরেশন, ওয়াসার সব কর্মকাণ্ড স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত। তাই গ্রামাঞ্চলে যেমন স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকাণ্ড নিয়ে সংবাদের যথেষ্ট উৎস রয়েছে, তেমনই শহরেও কম নয়। তাই সংবাদ প্রকাশে আগে প্রয়োজন সততা ও পারার মানসিকতা। এরপর উৎস হতে পারে সংবাদের সবচেয়ে বড়ো সূত্র। এই সূত্র ধরে এগিয়ে গেলেই বেরিয়ে আসতে পারে অনেক বড়ো ঘটনা।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট

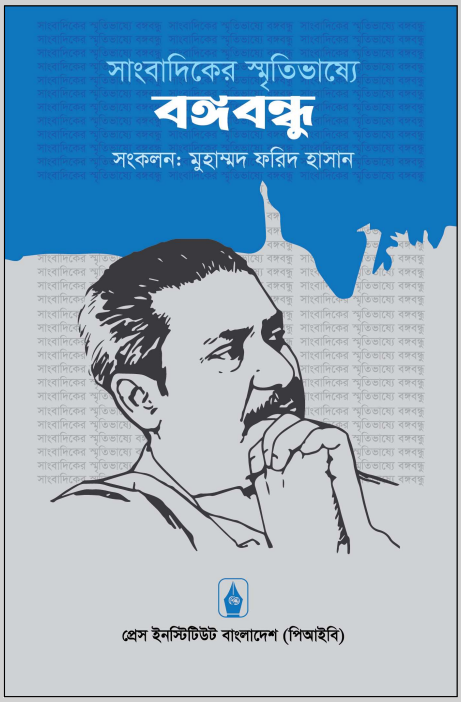

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেখ মুজিবের মতো এমন সম্মান আর কেউ অর্জন করেননি

—হায়দার আকবর খান রনো

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা হায়দার আকবর খান রনো। এই পরিচয়ের বাইরেও তিনি একজন লেখক। তাঁর লেখার উপজীব্য রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞাননির্ভর। ১৯৪২ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতায় নানাবাড়িতে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস নড়াইল জেলায়। তাঁর শিক্ষাজীবন যশোর জিলা স্কুল, নটরডেম কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাত্রজীবনে তাঁকে বলা হতো অনলবর্ষী বক্তা। রাজনীতির শুরুটা গোপন কমিউনিস্ট পার্টি দিয়ে। পরে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৬৬ সালে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানেও তাঁর ভূমিকা ছিল। ১৯৭১ সালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি সশস্ত্র ঘাঁটি তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানেও তাঁর অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য ছিলেন রনো। ছাত্রজীবনেই বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। রাজনীতিতে বিপরীত ধারার হলেও জেল খেটেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা স্মৃতি আজও তাঁর অমলিন। সেই স্মৃতিময় কিছু কথা তুলে এনেছেন–**বনশ্রী ডলি**।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম দেখা, পরিচয়, কোন বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ে?

হায়দার আকবর খান রনো: সেই ছোটোবেলা থেকেই মাঠে-ময়দানে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনেছি, তাঁকে দেখেছি। আমি ১০ বছর বয়সেই শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনেছি। মনে আছে, যশোরে প্রেস ক্লাবে একটা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম, তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। পরে ঢাকায়ও শুনেছি তাঁর বক্তৃতা। তবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি প্রথম পরিচয় কোথায়-কখন, মনে পড়ে না। ১৯৬২ সালে আমি প্রথম জেলে যাই, তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থেকেছি। শিক্ষা আন্দোলনের পরের ধাপে আন্দোলনের সময়টাতে। এটা শুরু হয় পহেলা ফেব্রুয়ারিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা হরতাল করা হয়। সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হন তখন। এর আগে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের গোপন বোঝাপড়া ছিল। সিদ্ধান্ত হয়, বাষট্টির ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলকে আইয়ুব খানবিরোধী মিছিলে পরিবর্তিত করব।

বনশ্রী ডলি: সেই সময় কি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সমন্বিতভাবে আন্দোলনে অংশ নিত?

হায়দার আকবর খান রনো: অফিশিয়ালি সব পার্টি ব্যান্ড ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তো ছিলই। ৩১ মার্চ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হওয়ার পর আওয়ামী লীগের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। আমরা ভাবলাম এটা একটা সুযোগ। এই সুযোগটা নিতে হবে। শেখ ফজলুল হক মণিসহ আরও কজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। আমিও করেছি, কমরেড ফরহাদ করেছেন। পরে কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেনন করেছেন। পরবর্তী সময়ে যে শিক্ষা আন্দোলন হয়, তখন মতিয়া চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন এসেছেন। সে সময়টাতে আইয়ুব খান তো মার্শাল ল চালাচ্ছেন। তিনি ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে একটা কনস্টিটিউশন দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং দিলেনও। তিনি বললেন, 'আই ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার দ্য কনস্টিটিউশন অব পাকিস্তান'। কোনো একটা কমিটি নয়, পার্লামেন্টেও নয়, এক ব্যক্তি একটা দেশের কনস্টিটিউশন দিচ্ছেন! খুবই বাজে কনস্টিটিউশন। অ্যানিওয়ে, এরই মধ্যে কমিউনিস্ট, ভাসানী ন্যাপ নেতারা জেলখানায় বন্দি। অলমোস্ট, ৯৮ পারসেন্টই জেলে। আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের কেউই গ্রেফতার ছিলেন না; একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই গ্রেফতার হয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের গ্রেফতার করেছিল পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে, যাকে বলে বিনা বিচারে আটক। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়। দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তখন ফরিদপুর জেলে ছিলেন। পরে তিনি আপিল করেন হাইকোর্টে। হাইকোর্ট মুক্তি দেয়; তখন তিনি ফ্রি ম্যান হয়ে গেলেন। তখনও সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হননি। এই সময় নূরুল আমীন, ভাষা আন্দোলনের ঘাতক; সেসময় এক বিয়েতে কয়েকজন নেতা আমন্ত্রিত ছিলেন। এটা আমার শোনা গল্প, সেখানে তারা আলোচনা করেন, কী করা যায়। মার্শাল ল উঠে যাবে আইয়ুব খান ঘোষণা দিয়েছেন। তো উঠে গেলে কী করা যায়, তা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। আইয়ুব খানকে সবাই তো ভয় পায়! ক্লিকবাজ লোক; কখন যে কার সঙ্গে লাইন দেন সেটা বোঝা মুশকিল। এদিকে সোহরাওয়ার্দী অর্ধেক সময় এখানে থাকতেন, অর্ধেক সময় থাকতেন করাচিতে।

চার বছর ধরে পার্টি ব্যান্ড, গোপনে কোনোরকম কাজকর্মগুলো চালাই। শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেকের সঙ্গে আলোচনায় ঠিক হলো, ধর্মঘট দেব। সেটা বাষট্টিতে। আমাদের সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনাই ছিল বাষট্টির ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে অ্যান্টি আইয়ুব মুভমেন্ট শুরু করব। কিন্তু এ ঘটনার (সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার) পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, ধর্মঘট এগিয়ে নিয়ে আসব। কারণ, ছাত্রলীগের আগ্রহ আছে। শেখ ফজলুল হক মণি, কমরেড ফরহাদ, আমি আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত হাতে পোস্টার লিখলাম, হলগুলোয় লাগানো হলো।

১৯৬১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট/ওয়ার্কার্স পার্টিতে যুক্ত হলাম। তবে সেই আন্দোলনে পার্টির ব্যাপার ছিল না। তবে আমি ও ফরহাদ ভাই পার্টির লোক। সেদিন আমতলায় শ পাঁচেক ছাত্রের সমাবেশে একটি টেবিলে দাঁড়িয়ে একমাত্র আমিই বক্তৃতা করি, জীবনে প্রথম বক্তৃতা। আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে এটাই আমার প্রথম প্রকাশ্য বক্তব্য ছিল, দিনটা ছিল ১৯৬২ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি। আন্দোলন শুরু হওয়ার পর বাসা থেকে পালিয়ে গেলাম। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র, আমাকে কে চেনে? শেখ মুজিবকে সবাই চেনে। তারপরও গ্রেফতার হই; আর্মি ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম সাতদিন; এইটথ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট। এরপর আমাকে নিয়ে আসা হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে, ২৬ নম্বর সেলে। জেলখানার মধ্যে ছোটো ছোটো জেলখানা আছে, ২৬ তেমনই একটা সেল। রাতে সেলে আটকা থাকতাম, দিনে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা একসঙ্গে হতাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম ২৬ নম্বর সেলে। বঙ্গবন্ধু খুব ভালো ভলিবল খেলতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে জেলখানায় ভলিবল খেলেছি। তিনি লম্বা মানুষ, চাপ দিতে পারতেন ভালো। তখন তাজউদ্দীন আহমদও ছিলেন জেলে। উনি আমাকে আদর করে খাওয়াতেন–ফল, গোশত। বঙ্গবন্ধুও আমাকে খাইয়েছেন আদর করে। আমার বয়স তখন ১৯ বছর। বিখ্যাতদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন ছিলেন তখন জেলে–তাঁরা কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট নেতা তকিউল্লাহ এবং দৈনিক ইত্তেফাকের মানিক মিয়াও তখন জেলে।

বনশ্রী ডলি: জেলখানায় থাকার সময়টাতে কাছ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেমন দেখেছেন, কী আলোচনা হতো?

হায়দার আকবর খান রনো: শেখ মুজিব তখন বড়ো নেতা। কী এমন আলোচনা হবে। ওনার ওপরে আরও নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তবে শেখ মুজিব নেতা হিসাবে ক্রমেই জননেতা হয়ে উঠছেন সেসময়টাতে।

বনশ্রী ডলি: ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ছয় দফার সময়টায় রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোয় আপনাদের ভূমিকা, বামপন্থি কোন অংশ তা সমর্থন করেনি এবং কেন? একটু বিস্তারিত বলবেন।

হায়দার আকবর খান রনো: একটু আগে থেকে বলছি, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। তখন আইয়ুব খান বলছিলেন যে, কাশ্মীর নিয়ে আসব। যুদ্ধের পর আইয়ুব খানের অবস্থা টলটলায়মান। ওই সময় ওয়েস্ট পাকিস্তানের লিডাররা সেখানে কনফারেন্স ডাকেন আইয়ুবের বিরুদ্ধে। কনফারেন্সে মওলানা ভাসানীকে ডাকা হয়নি; কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডেকেছেন তারা। শেখ মুজিব যোগ দেন। কনফারেন্সের শেষ দিন শেখ মুজিব বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমার মিলল না। বেরিয়ে এসে লাহোরে ছয় দফা ডিক্লেয়ার করেন। এটা কিন্তু আওয়ামী লীগের কেউ বা আমরা কেউ জানি না। ঢাকায় ফিরে পল্টন ময়দানে যে ছয় দফার ঘোষণা দিয়ে বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতা শুনেছি। সেদিন খুব বেশি জনসমাবেশ হয়েছে এমন নয়, কমও নয়। ছয় দফা ঘোষণার সময় ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আসে, জনগণ দৌড়ে স্টেডিয়ামের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। শেখ মুজিবুর রহমান তখন মাইকটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আসার দরকার নেই, আপনারা ওখান থেকেই শোনেন।' আমার মনে আছে, এরই মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র

মামলার বিষয়টি আসে। একই সঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটে। এ মামলায় শেখ মুজিবকে জড়ানো হয়। তাঁকে যত জড়াচ্ছে, তত তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। কবছরের মধ্যে শেখ মুজিব যে হাইটে চলে গেলেন, আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেখ মুজিবের মতো আর কেউ এমন সম্মান অর্জন করেননি। নট ইভেন মহাত্মা গান্ধী। এটা জোরের সঙ্গেই বলছি। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি।

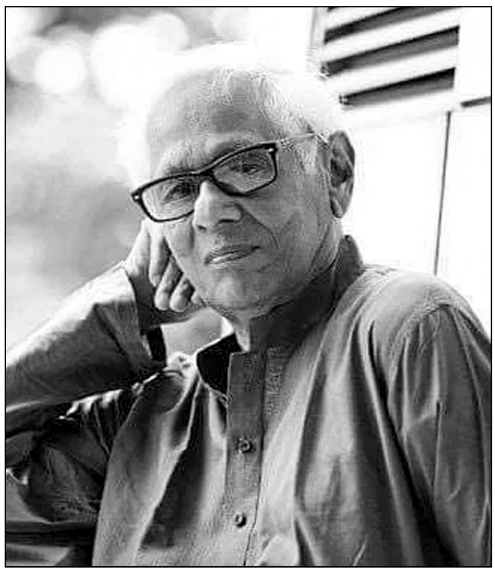

১৯৭১ সালের মার্চে দেখলাম, একটা মানুষ, যাঁর কোনো অফিশিয়াল পজিশন নেই, না প্রেসিডেন্ট, না গভর্নমেন্টে কিচ্ছু না; কিন্তু তিনি যা অর্ডার দিচ্ছেন, সবাই সেটা মানছে। কীরকম অর্ডার? কেবল পাবলিককে নয়, গভর্নমেন্ট অফিসকে, ব্যাংকগুলোকে। ব্যাংক তুমি এত টাকা দেবে এতটা পর্যন্ত, অফিস-আদালত এতটা পর্যন্ত চলবে বা চলবে না। সেটা হুবহু মানছে সবাই।

বনশ্রী ডলি: এই যে তিনি নেতা হয়ে উঠলেন, মানুষের আস্থার জায়গায় পৌঁছলেন, এটা কি ছয় দফার সফলতা? তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির, গোটা জাতির এত আস্থার কারণ! আপনার বিশ্লেষণ কী?

হায়দার আকবর খান রনো: এর বড়ো কারণ তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে। ছয় দফা ছিল স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে মোস্ট রেডিক্যাল দাবি। যেটা পাকিস্তানিরা মানতে পারেনি। জনগণ এই ছয় দফার বিষয় অতশত বোঝেনি, তবে বুঝে নিয়েছিল যে ওদের সঙ্গে আর না। যেটা কাগমারি সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'আস্‌সালামুআলাইকুম'। এর ১০ বছর পর একই কথা বললেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু জনগণ ধরে নিয়েছে, নেতা কী চাইছেন।

আর ছয় দফা? সারা দেশে ছয় দফার প্রচার বিষয়ে বলছেন? বড়ো নেতারা যেমন ফজলুল হক, ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান সহজ ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তাঁরা ভালো বক্তা বা বাগ্মী ছিলেন। অবশ্য সোহরাওয়ার্দী নন, তিনি উর্দু মিশিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু অন্যরা মানুষের মন বুঝে কথা বলতে পারতেন। দ্যাট ইজ নট দ্য অনলি কজ। বঙ্গবন্ধুর বাগ্মিতাই একমাত্র কারণ নয়, এটি একটি অ্যাডিশনাল ফ্যাক্টর। ছয় দফার কঠিন বিষয় সব বাঙালি বুঝেছিল, তা আমার মনে হয় না, কারণ বলছি। তাঁরা মোদ্দা কথা বুঝেছিল যে, বাঙালির আলাদা হতে হবে। ছয় দফার একটা দফা আছে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও বুঝতে অসুবিধা। যেমন: দুটো স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং দুটো কারেন্সি বা মুদ্রা থাকবে। এটা অলটারনেট প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। এর কোন রেশিওতে কোন ভাগ হবে প্রভৃতি কথাগুলো রয়েছে। আরেকটি–রিজার্ভ ব্যাংক, এখান থেকে যে আয় হবে, বাণিজ্যিক আয়, তা এখানের রিজার্ভ ব্যাংকে জমা হবে। এর একটা অংশ ওখানে যাবে। এগুলো জটিল বিষয়। অত কঠিন বিষয় সাধারণ মানুষের বোঝার কথা নয় সেই সময়টাতে, এটি আমার ধারণা। লাইন বাই লাইন বুঝে বাঙালি সব করেছে, তা নয়। তবে সব মানুষ আন্দোলনে নেমেছে।

বনশ্রী ডলি: পরে ১১ দফার প্রয়োজন হলো?

হায়দার আকবর খান রনো: ১১ দফা পরে এলো। ১১ দফার চার নম্বর দফাটা হলো ছয় দফা। বাকি ১০ দফা আলাদা। এটা না হলে সব দল একসঙ্গে হতো না বা আন্দোলনে শামিল হতো না। এটার তো অতীত আছে; এর আগে বঙ্গবন্ধু সমর্থন করেছেন এমন কিছু বিষয় ছিল। যেমন: পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিসহ প্রভৃতি বাতিল করতে হবে–এমন কয়েকটি দফা ছিল ১১ দফায়। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি যেটা বলত–ভাসানী তো বলেছিলেন, ৯৮ পারসেন্ট অটোনমি হয়ে গেছে, টু পারসেন্টের জন্য ছয় দফা দিচ্ছে মুজিব? এখানে তিনি জাতীয়তাবাদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। এর সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক এবং আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিষয়গুলো যুক্ত হলো। ছয় দফায় ছিল শুধু ইস্ট পাকিস্তান ভার্সেস ওয়েস্ট পাকিস্তানের বিষয়গুলো। কিন্তু শ্রমিকের মজুরি কী হবে, কৃষি অবস্থা কেমন হবে, ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কত হবে, সিয়াটো সেন্টো কী হবে, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির কী হবে, ফরেন পলিসির কথা–এগুলো ১১ দফার মধ্যে এসেছে।

১১ দফাটা ছিল সামগ্রিক বিষয়ে। ছয় দফায় ছিল শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারগুলো। তাই ১১ দফা ইজ মোর কমপ্রিহেনসিভ।

১১ দফার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯-এ তো গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থানে মওলানা ভাসানীর বিরাট অবদান রয়েছে। আরও ছিলেন ছাত্রসমাজ ও শ্রমিকরা। শ্রমিকদের ঘেরাও কর্মসূচি ছিল সফল। ওই পরিস্থিতিতে আর্মি চিফরা দেখেন যে আইয়ুব খানকে দিয়ে আর চলবে না। তখনই মার্শাল ল দিল।

তখন শ্রমিক আন্দোলনে জড়িত ছিলাম। একটা ঘটনা মনে পড়ছে, ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সময় কারখানা দখল করতাম। দখল করে লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পরে বরখাস্ত সব শ্রমিককে আবার রেজিস্টার্ড করে সবার বেতন ডাবল করার ব্যবস্থা করেছি আমরা। প্রথমে টঙ্গীতে অলিম্পিয়া কারখানা দখল করি। এসব চলাকালীন আমার বাবার বন্ধু ছিলেন এক কারখানার বাঙালি মালিক, তাকেও শ্রমিকরা ঘেরাও করেছিল। আমরা জোর করে ঘেরাও করার ফলে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাসটা বেড়েছে। জোর করে আমরা সাইন করিয়েছি, আন্ডার কোয়ালিশন। এটা লিগ্যাল গভর্নমেন্ট মানতে পারে? পারে না। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পরপরই তিনি ঘোষণা দেন, আন্ডার কোয়ালিশন যেসব চুক্তি হয়েছে সব থাকবে। কেন এটা করলেন? পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য। শ্রমিকদের আন্দোলন থামানোর জন্য এটা মেনে নেয় সরকার, তা না হলে উপায় ছিল না। সেই একই কারণে প্যারিটি উঠিয়ে দিয়ে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট প্রবর্তন করে। আশা করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেজরিটি পাবেন না এবং শ্রমিকরাও শান্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই হয়নি।

বনশ্রী ডলি: আন্দোলন হলো, সত্তরের নির্বাচন হলো, প্রায় সব আসনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়, এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কী ছিল, সেসময়টায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক, বোঝাপড়াটা, সমন্বয় কেমন ছিল...

হায়দার আকবর খান রনো: ১৯৭০-এর নির্বাচন মওলানা ভাসানী করেননি। অনেকে বলে, শেখ মুজিবের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তিনি অংশ নেননি নির্বাচনে। তবে আমি সিওর না। কমিউনিস্ট পার্টি তো তখন বেআইনি, গোপনে কাজ চালায়। ন্যাপ নির্বাচন করেছে 'কুঁড়ে ঘর' মার্কায়, আসন পায়নি। ন্যাপ কতটা শক্তিশালী? ন্যাপ মানে তো ভেতরে কমিউনিস্ট পার্টি। ভাসানী ন্যাপ মানে হচ্ছে এর ৯০ শতাংশই কমিউনিস্ট। এর সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে সবাই কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান্ড থাকায় ন্যাপ গঠন করতে হলো।

বনশ্রী ডলি: এ সময়টাতে গলা কাটা রাজনীতি ও সর্বহারাদের রাজনীতি বিষয়ে জানতে চাইছি?

হায়দার আকবর খান রনো: ভারতে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে একটা আন্দোলন শুরু হয়, বলা হয় নকশাল আন্দোলন। কারণ, এটা নকশালবাড়ি থেকে শুরু হয়েছিল। আমি কিন্তু চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি করতাম। এ দেশে চীনপন্থি এই পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও আমি। নকশাল আন্দোলন আমরা কখনো গ্রহণ করিনি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর চীন যখন আমাদের বিরোধিতা করে, অন্যদের সঙ্গে আমিও সেটাকে সমালোচনা করেছি। চীনপন্থিদের মেজর অংশ চীনের ভূমিকা ও বিরোধিতাকে কনডেম করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, সেপারেটলি।

চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির ছোটো অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে বা অংশ নয়। তারা ছিল নকশাল দ্বারা প্রভাবিত। নকশালটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ব্যাপার। এটাকেই গলা কাটা রাজনীতি বলে। বাংলাদেশেও নকশালপন্থি ছিল, আন্দোলন ছিল। আমিও তো কিছুকাল করেছি নকশাল আন্দোলন। নকশাল মুভমেন্ট একটি আন্দোলনের ধারা। যে ধারাটি বলে, পার্টি প্রকাশ্যে হবে না, ইলেকশন করবে না, গোপনে থাকবে, জোতদারের গলা কেটে মানুষকে জাগ্রত করতে হবে, প্রান্তিক মানুষকে সহায়তা করতে হবে। গরিব মানুষকে সচেতন করতে হবে। এটা হচ্ছে নকশাল আন্দোলনের সামারি অব সাবস্টেন্স।

অবশ্যই তা বেঠিক ছিল। তবে এই ধারার এক বিরাট স্রোত বয়ে গিয়েছিল, এটা অস্বীকার করা যাবে না। এর প্রভাব ইন্ডিয়া ও পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে, পড়েছে বাংলাদেশেও। আমিও প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আমরা এ থেকে বেরিয়ে আসি।

বনশ্রী ডলি: কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারলেন?

হায়দার আকবর খান রনো: অভিজ্ঞতা। এই মোহটা হতো না, যদি না চায়না বা পিকিং সাপোর্ট না দিত। চায়না দেওয়ায় আমরা উদ্বুদ্ধ হলাম। কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে দেখলাম, এটা তো ভয়াবহ; যেমন বলছে–ট্রেড ইউনিয়ন করা চলবে না। উদাহরণ দিই। টঙ্গীতে আমার এবং কাজী জাফরের শ্রমিকদের মাঝে অসম্ভব প্রভাব ছিল। আমাদের এক ডাকে ২০ হাজার শ্রমিক আধ ঘণ্টার মধ্যে জড়ো হতো। তখন আমরা শ্রমিকদের বললাম, এখন তো কমিউনিস্ট পার্টির লাইন অন্যরকম হয়ে গেছে, আমরা আর ট্রেড ইউনিয়ন করব না। কারণ, প্রকাশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে না–আমাদের রাজনৈতিক লাইন সেটাই বলছে। তখন শ্রমিকরা বলছে, ঠিক আছে, আপনারা শিক্ষিত মানুষ, এখানকার শ্রমিকও না, আপনারা না হয় করলেন না; আমরা শ্রমিক, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে। নাহলে ট্রেড ইউনিয়ন ছেড়ে দিতে হবে দালালদের হাতে। শ্রমিকদের কথা শুনে আমরা কী করব? এর জবাব আমরা দিতে পারিনি। পরে আমরা নিজেরাও দেখলাম, এই আন্দোলন ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, আমাদের অবস্থা সে জায়গায় আসেনি। ফলে আমরা আগের মতোই করে যাব। এটা একটা গোঁজামিল দিলাম। আরও পরে এসে বললাম, এটা একটা ভুল পথ। নকশাল বাড়ি ভুল ছিল! আমার একটি বই আছে, আত্মজীবনী টাইপের বই, শতাব্দী পেরিয়ে। পড়ে দেখতে পারেন। এখানে কিছু কিছু আছে।

বনশ্রী ডলি: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

হায়দার আকবর খান রনো: মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি পূর্ববাংলা বিপ্লবী সমন্বয় কমিটির নামে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি ঘাঁটি ছিল আমাদের; প্রায় ৩০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। বেশির ভাগ ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কমিটির শহিদের সংখ্যা শতাধিক। সেই সময় আমাদের সংগঠন এবং আরও যাঁরা যেমন: ভাসানী ন্যাপের একটা অংশ, আরও ছোটো ছোটো দল মিলে কলকাতার বেলেঘাটায় একটা মিটিং করি।

৭ মার্চের আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। ১৯৬৯ সাল থেকেই পরিকল্পনা করছি যুদ্ধ করব। পরিস্থিতি আমাদের সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছিল। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, এখন যে জায়গাটায় শিশুপার্ক; সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের কাছাকাছি। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাটি ছিল সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত। এ বক্তৃতায় অনেক ধরনের কথা রয়েছে। এতে চারটি টার্ম দিয়েছেন তিনি। শর্ত দিচ্ছেন, যুদ্ধের মধ্যেও এটা হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আলাপ-আলোচনার জন্য টেবিলে বসে, বঙ্গবন্ধুও টেবিলে বসার রাস্তাটি খোলা রেখেছেন। তিনি একবারও স্বাধীনতার কথা আগে বলেননি। শেষে এসে তিনি বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মানুষ যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। একমাত্র স্বাধীনতা শব্দটা ছাড়া বঙ্গবন্ধুও বাংলাদেশ স্বাধীন করবেন–একথা বলেননি। তিনি তো নির্বাচন করেছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এটা তো প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া খানের নিয়ম অনুসারেই করেছেন। তিনিই তো হওয়ার কথা। হওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, সেটা হলে পার্লামেন্ট বা সংসদ বসবে, নিয়ম অনুসারে পার্লামেন্ট বসার তিন মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সংবিধান তিন মাস কেন, তিন ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করা যায়। নিয়ম অনুযায়ী সিঙ্গেল ভোট হবে। বলেছিল, একই সঙ্গে পার্লামেন্ট বসবে, বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সংবিধানও প্রণয়ন করা হবে ছয় দফার ওপর ভিত্তি করে, (অন দ্য বেসিস অব সিক্স পয়েন্ট) যেটা তারা মানতে পারেনি। ক্রাইসিসটা তো এই জায়গায় গেছে।

বনশ্রী ডলি: আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমন্বয় বা আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন?

হায়দার আকবর খান রনো: ঠিক তা নয়। তবে যুদ্ধ করতে হবে, এটা ধরেই নিয়েছিলাম। এরই মধ্যে মার্চে একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক রফিকুল স্যারের বাসায় কাজী জাফর, শেখ ফজলুল হক মণি ও আমি আলোচনায় বসেছিলাম। কী করা যায়, কীভাবে হতে পারে, আমরা কী করব, সেদিন রাতে আমরা স্যারের বাসায় থেকে গিয়েছি।

বনশ্রী ডলি: ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ?

হায়দার আকবর খান রনো: পাকিস্তান জমানার শেষ মিটিং আমরা বিপ্লবী সমন্বয় কমিটি সভা করেছিলাম ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, বিকালে পল্টন ময়দানে। প্রায় দুই লাখ মানুষ জমায়েত হয় সেদিন। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দুই লাখ মানুষ হওয়ার কথা নয়। পরিস্থিতির কারণে এত মানুষ এসেছে সভায়। (সেদিন সকালেও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে

> একটা মানুষ, যাঁর কোনো অফিশিয়াল পজিশন নেই, না প্রেসিডেন্ট, না গভর্নমেন্টে কিচ্ছু না; কিন্তু তিনি যা অর্ডার দিচ্ছেন, সবাই সেটা মানছে। কীরকম অর্ডার? কেবল পাবলিককে নয়, গভর্নমেন্ট অফিসকে, ব্যাংকগুলোকে। ব্যাংক তুমি এত টাকা দেবে এতটা পর্যন্ত, অফিস-আদালত এতটা পর্যন্ত চলবে বা চলবে না। সেটা হুবহু মানছে সবাই

পাকিস্তানিদের আলোচনা হয়েছে বা ইয়াহিয়া শক্তির আলোচনা হয়েছে।) সেদিন মিটিংয়ে জনগণকে বলেছি, এ দুই পক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার কথা বলে দিয়েছেন। স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে, যুদ্ধ করতে হলে গ্রামে চলে যান। গ্রামে গিয়ে সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধ শুরু করতে হবে। সভা শেষ। টঙ্গী থেকে প্রায় একশ বাস ভরে শ্রমিক-জনতা সভায় যোগ দেয়। তখন ভাড়া করে নয়–এমনিই বাস কেড়ে নিয়ে মানুষ চলে এসেছে। ওদের বিদায় করে রাশেদ খান মেনন, কাজী জাফর ও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে গেলাম। ক্যান্টিন মালিক মধুদা ডিম ভেজে আমাদের খাওয়ালেন। ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণে মধুদা মারা যান।

মধুর ক্যান্টিন থেকে বাসায় ফিরে আসি। আমার ছোটো ভাই দুই বা তিনদিন আগে বিয়ে করেছে। আমি তখনও বিয়ে করিনি। সন্ধ্যায় একজন ফোন করে বলছেন, শহরে তো পাকিস্তান আর্মি নেমে পড়েছে জানেন? বললাম, না, এখনো জানি না তো! তিনি বলছেন, আমার একটা বন্দুক আছে, সেটা কি আপনাদের দেওয়া যাবে বা রাখা যাবে? তখন বুঝলাম এটা তো মুশকিল, এখানে থাকা যাবে না। আমরা বেরিয়ে পড়লাম, ছোটো ভাই গাড়ি চালাচ্ছে, গাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। রাস্তায় পাক আর্মি নেমেছে। ধানমন্ডিতেই মাহফুজ ভুঁইয়ার বাসায় যাই। সবাই মিলে অন্য জায়গায় থাকার প্রস্তাব করি। থাকার জায়গা ঠিক করলাম। তিনি বলেন, আপনারা তো যেতে পারবেন না, কাছেই ইপিআর ক্যাম্প। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। তাই নাকি? সেই বাসা থেকে অনেকটা ঘুরে গিয়ে ধানমন্ডি-৭-এ আমার খালার বাসায় ছিলাম তিন দিন, তিন রাত।

২৫ মার্চ রাত! কিছুক্ষণ পরপরই আকাশ লাল দেখাচ্ছে, আগুনের হলকায় আকাশ আলো হয়ে উঠছে, অনবরত গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ২৬ মার্চে কারফিউ। টেলিফোনের লাইন কাটা, টিভিতে কিছুই ঠিক খবর পাইনি। এত ভয়াবহ ঘটনা খবরও পাইনি। ইলেকট্রিসিটি কেটে দিয়েছে, বুঝতে পারিনি। ২৭ মার্চ কারফিউ কিছুক্ষণের জন্য উঠে যায়।

২৭ মার্চ শহিদজননী জাহানারা ইমামের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা রুমি (আমাদের পার্টির সদস্য ছিল) আমাদের এ বাসায় এসে শোনে আমরা খালার বাসায় আছি। রুমির গাড়িতে ঢাকা নগরীর কিছু এলাকা ঘুরে দেখলাম বস্তি পুড়ে গেছে, লাশ পড়ে আছে যত্রতত্র। পরে চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। জহির রায়হান তাঁর গাড়িটা আমাদের দিলেন। তিনিও আমাদের সমন্বয় কমিটিতে ছিলেন। সেই গাড়িতে আমরা গেলাম নরসিংদীর শিবপুর আমাদের গেরিলা ঘাঁটিতে। ঘাঁটির মূল নেতা ছিলেন মান্নান ভূঁইয়া (তিনি বিএনপির মন্ত্রী ও মহাসচিব হয়েছিলেন)। আমাদের ১৪টি ঘাঁটির প্রধান ঘাঁটি ছিল শিব-পুর। তিনি সেখানেই থাকতেন। তখন দেশের মধ্য দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যেত না, চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর যাওয়া যাবে না। ইউ মাস্ট ইউজ ইন্ডিয়ান ল্যান্ড। আমরা তখন ভারতে গেলাম। জুনের ১/২ তারিখ প্রথম কনফারেন্স করলাম কলকাতার বেলেঘাটায়। যাতায়াতের মধ্যেই ছিলাম। মূল কাজ ছিল অস্ত্র সংগ্রহ করা। ইপিআর আমাদের যারা পিছু হটছিল, তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতাম। এছাড়া যুদ্ধে নিহত পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে আমাদের যোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতাম। যোদ্ধা মানে সবাই গেরিলা, কেউ তো ট্রেনিং নিইনি। কেন? যাইনি ট্রেনিং নিতে, গেলেও আমাদের নিত না। সে আরেক গল্প। এরই মধ্যে পাকিস্তান আর্মির এক কমান্ডার ফজলুল মৃধার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ছুটিতে এসেছিলেন তিনি। তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের ট্রেনিংগুলো দেন। আমাদের গেরিলা বাহিনীর প্রধান কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন তিনি আর আমার ছোটো ভাই। আমার ছোটো ভাই মারা গেছে। আরেকজন ছিলেন নরসিংদীর মোগল সিরাজ। নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর অ্যাসোসিয়েট হন। তিনি অনেক অস্ত্র সংগ্রহ করেন। এমন বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে কাজ হয়েছে। ভারত অস্ত্র দেয়নি বরং আমাদের নকশাল বলে হয়রানি করেছে। আমাকে গ্রেফতার করেছে। ইন্ডিয়ায় আমাদের সব ধরনের সাহায্য করেছে সিপিএম। তাদের পার্টির সব সদস্যের একদিনের বেতন আমাদের জন্য দিয়েছিল। তবে মস্কোপন্থিদের সব সাহায্যই দিয়েছে ভারত। কারণ, সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার সময় ভারতের শর্ত ছিল যে আমাদের যোদ্ধাদের আলাদা ট্রেনিং দিতে হবে। মস্কোপন্থিরা বাংলাদেশের ভেতরে খুব বেশি ঘাঁটি গড়ে তোলেনি। একবার একটি বড়ো দল দেশে ঢোকার পরে বেতিয়ারায় লড়াইয়ে পড়ে, শহিদ হন ১১ জন। এটাও সত্যি, কিছু কিছু সেক্টর কমান্ডার সাহায্য করেছেন আমাদের।

বনশ্রী ডলি: পুরোপুরি সশস্ত্রযুদ্ধে যোগ দিলেন কোন সময়টায়?

হায়দার আকবর খান রনো: এর আগে থেকেই গোপনে বোমা বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পঠিয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল এসব বোমা যুদ্ধের প্রকৃত বোমার কাছে কিছু না। বিকট আওয়াজ হতো; কিন্তু ইফেক্ট ইজ নাথিং। এখন মনে হলে হাসি পায়। ছোটো ভাই ফরমুলা বের করে, সে অনুযায়ী টঙ্গীতে বসে বোমা বানাতাম। তবে সত্যিকার ফরমুলা ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছ থেকে

পেয়েছি। সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিইনি। ক্লাস নেওয়া, অস্ত্র সংগ্রহ, উদ্বুদ্ধ করা, কৌশল, যোগাযোগ রক্ষা–এসব করেছি।

বনশ্রী ডলি: যুদ্ধকালীন কলকাতায় একটা মূল অফিস ছিল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। এর সঙ্গে কি আপনাদের কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল? মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে?

হায়দার আকবর খান রনো: না, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। হ্যাঁ, অনেক স্মৃতি–কয়টা বলব? তবে একটার কথা বলি, আমাদের তিনটা মূল ঘাঁটি–শিবপুর, আগরতলা ও কলকাতা। মেনন, কাজী জাফর ও আমি প্রধানত বিভিন্ন জায়গায় যেতাম। দিনাজপুর গিয়েছি। এখানে-ওখানে। ঢাকায়ও এসেছি। এত স্মৃতি, এত স্মৃতি। একটা ঘটনা বলছি, একবার কাজী জাফর আমাকে চিঠি পাঠান, আমরা তখন শিবপুরে, কলকাতায় বসছি, ওই যে ২ জুন। এটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রচারে এসেছিল। এ বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গেও দেখা করেছি। তিনি সব শুনে খুব সন্তুষ্ট হননি। বললেন, এটা আবার কোন ঝামেলা করতে এলে? বললাম, তাহলে আমাদের সাহায্য করেন। সেই সময় কমরেড মণি সিংহ বা মণিদার সঙ্গে একটা বিরোধ চলছিল। এর মধ্যে আমরা যদি আরেকটা ঝামেলা লাগাই, তাহলে তো সমস্যা। একদিন মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান সালো আর আমি ঢাকা থেকে এদিক-ওদিক করে গ্রামের পথ দিয়ে কুমিল্লা যাচ্ছি, মে মাসে। বাসে যাচ্ছি, যাত্রী খুব কম। বাসে দেখলাম কিছু দুর্ধর্ষ টাইপের পাকিস্তানি লোক উঠল, কিছুটা পরে নেমেও গেল। আমাকে বাস কন্ডাক্টর বলছে, আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা? আমি রেগে গেলাম, ধ্যাত, বাজে কথা কী বলছ? ও বলছে, আরে না, অসুবিধা আছে। আমি আবারও বলি, মুক্তিযোদ্ধা হব কেন, আমি পাকিস্তানি। ক্ষণিক পরে বলে, আপনি কি হিন্দু? বলি আবার একই কথা, বাজে কথা! বলে নাম কী? একটা ফার্স নেম বললাম, যাব ফেনী, এই গ্রাম, এসব আরকি। ব্যাগের মধ্যে কী আছে? টর্চলাইট আছে? সালো বলে, হ্যাঁ, আছে। কন্ডাক্টর বলে, ফেলে দেন। সালো বলে, কেন, টর্চলাইট আমার লাগবে, এটা অস্ত্র নাকি যে ফেলব। সে আবারও বলে, ফেলে দেন। বলে সামনে কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট আছে। সার্চ করবে আপনাদের সবকিছু। আমরা বলি তাতে কী আছে। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভাব করলাম। ঠিক ক্যান্টনমেন্টের আগের স্টপেজে এসে কন্ডাক্টর দুজনকে টেনে-হিঁচড়ে বাস থেকে ফেলে দিল। বলে, কাছেই রিকশা আছে, দেখেন কোথাও যেতে পারেন কি না। সামনে ক্যান্টনমেন্ট, আপনারা তো স্বীকার করলেন না, বুঝলেনও না। একটা রিকশায় উঠলাম, কিছুটা দূরে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট দেখা যাচ্ছে। কামান দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। রিকশাওয়ালা বলে, আপনি কি ওপার যাবেন? বললাম, না, না, আমি ওপার যাব না। কুমিল্লার কাছে গ্রামে যাব। বলে, ওই পর্যন্ত আমি নিতে পারব না। বলি, থাকব কোথায় এখানে? তখন সে কুমিল্লা শহরে নিয়ে আসে। বিকাল হয়ে গেছে। আরেকটা রিকশা ধরিয়ে দিল সে। সেখান থেকে এক কমরেডের বাসায় গেলাম। তিনি নেই, যুদ্ধে চলে গেছেন। তার বাবাকে বললাম। তিনি আমাকে নামে চিনলেন, রাতে থাকতেও দিলেন। এখান থেকে যাব চিওরা গ্রাম, কাছেই বেতিয়ারা, সেই জায়গাটি। সেখানে কাজী জাফর আছেন। যাচ্ছি কাঁচা রাস্তা দিয়ে, রিকশায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। কিছু পরে বলে, নামেন, কেন? বলে, এখানে মুক্তি আছে, এই এলাকায় পাকিস্তানের পতাকা রাখা যাবে না, গুলি করবে। নামলাম, বাংলাদেশের পতাকা লাগাল। কিছুদূর যাওয়ার পরে বলে, আপনারা নামেন। আবার কেন? বলে, এখানে কোনো পতাকাই লাগানো যাবে না। হা হা হা, কোনোটাই লাগানো যাবে না। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি মানুষ দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। রিকশাওয়ালা বলেন, আমি আর যাব না, ফিরলাম। আমরাও নেমে গেলাম। দেখি চিওরার আগের গ্রামে নেমেছি। পরিচিত মানুষের দেখা পেলাম। ঘণ্টাখানেক থাকলাম। তখনই খবর এলো, পাকিস্তানি মিলিটারি এসে ৪০ মিনিটের মতো ছিল, লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আমরা যেতে পারি চিওরা। এর আগে সেই গ্রামে আমাদের স্কোয়াড তৈরি হয়েছিল। তখন গ্রামের বয়স্করা বলেছিলেন, বাবারা তোমাদের পক্ষে আছি, সবই ঠিক আছে; কিন্তু তোমরা এখানে কিছু কর না; গোলাগুলি কর না, তাহলে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। আমরাও বলেছিলাম, মুরুব্বিদের অসন্তুষ্ট করে, জোর করে এটা করা ঠিক হবে না। কিন্তু সেইদিন কিছুক্ষণ পরে জানলাম, ৪০ মিনিটের মধ্যে সেই গ্রামের আট নারীকে ধর্ষণ করে গেছে পাকিস্তান আর্মি। তখন মুরুব্বিরা বলেন, বাবারা এরা যদি আবার আসে তোমরা ছেড়ে দিও না। দিস ইস হাউ। হাউ পিপল ট্রান্সফরম! একটা উদাহরণ দিলাম। এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। সব লেখা যাবে না।

বনশ্রী ডলি: বিজয়ের আগে টের পেয়েছিলেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, বিজয় আসন্ন?

হায়দার আকবর খান রনো: প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিলাম, পাকিস্তানিদের জেতার কোনো কারণই নেই। কারণ, রাতে তো গ্রামগুলো মুক্ত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছে; প্রকাশ্যে লোকজন ভিড় করে শুনছে।

বনশ্রী ডলি: রুমির মৃত্যুসংবাদ কবে পেলেন?

হায়দার আকবর খান রনো: রুমির মৃত্যুসংবাদ আজও পাইনি! রুমি ঢাকায় একটা ক্র্যাক প্লাটুনে যুক্ত ছিল। খুব সাহসী ছেলে। সে ঘোষণা করেছিল, আজ এ এলাকায় পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হবে। শুনেছি, তারপর সে বাসায় ছিল। তাকে ধরে নিয়ে যায়, হি ওয়াজ পিকড আপ। রুমির মা ও বাবার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই ভালো পরিচয় ছিল আমার পরিবারের।

১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় ছিলাম। যুদ্ধের সময় আমার দায়িত্বে ছিল সাতক্ষীরা অঞ্চল। বিজয়ের কয়েকদিন আগের ঘটনা, ১৮ বছর বয়সি কামিল বখত নামে এক টগবগে তরুণ সাতক্ষীরায় যুদ্ধ করেছে। কলকাতায় একদিন কামিল আসে আমার কাছে। সারা রাত আলাপ-আলোচনা করি। ঠিক হলো অমুক তারিখে অমুক এসে নিয়ে যাবে প্রভৃতি। কিন্তু ওই তারিখ আসার আগেই খবর পাই কামিল নিহত হয়েছে। রাজাকার বা পাকিস্তানির হাতে নিহত হয়নি কামিল। আরেকটা গ্রুপ তাকে হত্যা করেছে। নাম বলব না; কিন্তু তারপরও ভাবলাম যা হয় হবে, সেখানে যাবই। কিন্তু এরই মধ্যে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইন্ডিয়ার সাইড থেকে তখন বর্ডার বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান সাইড থেকে তো আগেই সিল করা ছিল। ফলে আমি কলকাতা থেকে যেতে পারলাম না কোথাও। তখন থাকি পাক সার্কাসে। এর পরের কয়েকদিন কিছু করার ছিল না। ১৬ ডিসেম্বর পাক সার্কাসের মোড়ে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান (পরে প্রেসিডেন্ট হন) আমাকে ১০-১১টার দিকে প্রথম খবর দেন, জানেন কিছু? বললাম কী? বাংলাদেশ স্বাধীন! অনুভূতি? তা বলাই বাহুল্য, স্বপ্নের স্বাধীনতা...।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর কোনো খবর কিছু পেলেন তখন?

হায়দার আকবর খান রনো: নাহ! কোনো খবর পাইনি। এরপর সেখানকার সিপিএম নেতাদের সঙ্গে দেখা করি। জ্যোতি বসু, প্রেমেন দাশগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে। বললাম, আপনারা আমাদের টিকিট কেটে

> যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, এটার ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অনেক বাধা ছিল। শেখ হাসিনা না থাকলে আওয়ামী লীগের অন্য কোনো নেতা এটা পারতেন না। নিশ্চিত বলতে পারি, একমাত্র তিনি বলেই পেরেছেন

যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তারা যে টাকাটা তুলেছিলেন, পুরোটাই আমাদের দিয়েছিলেন। যখন চাইতাম দিতেন। কিন্তু এ টাকা দিয়ে আমরা কী করব, ওই টাকা তো এদেশে চলবে না। প্রেমেন দাশগুপ্ত বললেন, এখন যেও না। মাইন পুঁতে রেখেছে ওরা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাতে ছেলে-মেয়েদের হাত-পা চলে যাবে। একটু দেখে যাও। আমরা রাজি হলাম না এবং দুদিন পরই দেশে ফিরেছি।

আগরতলায় ঢুকলাম ১৮ ডিসেম্বর। সেদিনই দেশে ঢুকলাম। কুমিল্লার একটা রেস্টুরেন্টে রাতে থেকে ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরলাম। এসে দেখি আমার খালাতো বোন পাকিস্তানি আর্মির গুলিতে নিহত। ভাইয়ের স্ত্রী আহত, মা কিছুটা আহত। এর কারণ, আমাদের দোতলা বাসাটা যুদ্ধের সময় ফাঁকা ছিল। ৩২ নম্বরে বাসাটা হওয়ায় কিছু হয়নি। বিদেশি সাংবাদিকরা আসবে, তাই এখানের বাড়ি কিছু করেনি পাকিস্তানি বাহিনীরা। কিন্তু ফরমাল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমার বাবা-মা এ বাড়িতে চলে আসেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের আনন্দে জয় বাংলা চিৎকার করতে করতে খালাতো বোনটি রাস্তায় নেমে আসে। আমাদের বাসায় এসে সবাইকে বলে, আজকের দিনে ঘরে বসে থাকে কেউ! সবাইকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল। যুদ্ধের সময়টাতে ১৮ নম্বর রোডে একটি একতলা বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে রাখা হয়েছিল; আমাদের পরিবার সেখানে খোঁজ নিতে গেছে বঙ্গবন্ধুর পরিবার কী অবস্থায় আছে। কিন্তু ওখানে বাড়ির আশপাশে বাঙ্কার করে যে আর্মিরা ছিল, তারা তখনও সারেন্ডার করেনি। বাড়ির সামনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গুলি করে, খালাতো বোনটি নিহত হয়, ড্রাইভার নিহত হয়, মা আহত হন। আমার বোনটি পেশায় ছিলেন ডাক্তার। সেখানে সদ্য বিবাহিত আমার ভাইয়ের স্ত্রী আহত হন। আমি আসার পর গিয়েছিলাম সেই বাড়িতে। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা তখন বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার মা আহত হয়েছেন, দেখতে যেতে চাইলাম; কিন্তু ওরা বন্দুক ঠেকিয়ে বলে, খবরদার যাবে না।

বনশ্রী ডলি: ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু এলেন, গিয়েছিলেন সেদিন?
হায়দার আকবর খান রনো: নাহ, তখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাঁকে ঘিরে আছে। তবে পরে দেখা করেছি।

বনশ্রী ডলি: পরে কেমন দেখলেন বঙ্গবন্ধুকে, সংবিধান প্রসঙ্গ বলবেন?
হায়দার আকবর খান রনো: প্রথম কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টি যে যুক্ত হলো, এটি বিরাট ঘটনা। আমি মনে করি, আমাদের ইতিহাসে একটি উল্লম্ফন। বিশেষ করে যে context-এ অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম, সেই context-এ ২৪ বছর পর এমনটা হলো। ২৪ বছর আগে বঙ্গবন্ধুসহ যারা 'লাড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলেছেন, ২৪ বছর পর তাদেরই ছেলেরা সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। এটা বিরাট ঘটনা, বড়ো চেঞ্জ। এক জেনারেশনেই এত বড়ো চেঞ্জ, যা একস্ট্রিম, এনাদার একস্ট্রিম। দুই নম্বর হলো, সমাজতন্ত্র যুক্ত হয়, তবে এই সমাজতন্ত্র ধাপ্পাবাজি ছিল। সমাজতন্ত্রের ধারেকাছে দিয়েও যায়নি। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও সমাজতন্ত্র বলতেন, সবাই সমাজতন্ত্র বলত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে আমি এই ভূমিকার জন্য বিরাট মাপের চিত্রিত করতে চাই। নট অনলি দ্যাট, তিনি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বা রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন, যা ভারতও করতে পারেনি। জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ করেছে ঠিক আছে, তা নিয়েও অনেক কথাবার্তা আছে। ওদিকে যাচ্ছি না, তবে জিয়াউর রহমানকে ভীষণভাবে দোষারোপ করি এজন্য যে, সংবিধানের চার মূলনীতি থেকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়েছেন এবং মুসলিম লীগ ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ কীভাবে দেখেন?
হায়দার আকবর খান রনো: বাংলাদেশ হওয়ার পর পদক্ষেপ তিন বছর, বঙ্গবন্ধুর সময়টা তো তিন বছর। তিন বছরে এসব বিচার করা কঠিন। বাকশাল করাকে আমি ভুল মনে করি।

বনশ্রী ডলি: ভুল মনে করেন কেন?
হায়দার আকবর খান রনো: অবশ্যই। বাকশাল একদলীয় শাসনব্যবস্থা কখনোই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হতে পারে না। কেন কী, এটা ভেরি সিম্পল রিজন।

বনশ্রী ডলি: এরকম একটা আলোচনা আছে যে, বাকশাল গঠন ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার হত্যাকাণ্ডের জন্য কিছুটা দায়ী, এর আগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে, আপনার কি তাই মনে হয়?

হায়দার আকবর খান রনো: ব্যাপারটা হচ্ছে, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডকে দেখতে হবে আপনাকে পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের কনটেক্সটে (হোল হিস্টরিক অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড কনটেক্সটে)। ১৫ আগস্ট নট আ সিম্পল মার্ডার কেস, সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, এক নম্বর। সপরিবারে এরকম হত্যাকাণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাসে বহু কু হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে এভাবে সপরিবারে হত্যা করা! আমার জানামতে আরও হয়েছে কি না জানি না। আলেন্দেকেও হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে; কিন্তু সপরিবারে এভাবে হত্যা! এ তো গেল নৃশংসতার দিক। শুধু তাই নয়, কু দ্বারা কী হয়? একটা সরকারের বদলে আরেক সরকার আসে। এটা মুজিব সরকার বদলের সাধারণ বিষয় ছিল না। ইট ইজ নট আ সিম্পল চেঞ্জ অব লেজিস, ইট ইজ টোটাল চেঞ্জ অব অ্যাটিটিউড। তখন পৃথিবী দুটি ভাগে বা শিবিরে বিভক্ত ছিল। ইন্দিরা গান্ধী চান বা না চান তিনিও সমাজতান্ত্রিক নন; কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি সোভিয়েতের ক্যাম্পের মধ্যে ছিলেন। বাংলাদেশও সেই ক্যাম্পের মধ্যে ছিল। উইথ দিস কিলিং বাংলাদেশ চেঞ্জ এভার সাম দিস ক্যাম্প টু প্রো অ্যামেরিকান ক্যাম্প।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সেনা দ্রুত ফিরিয়ে নিতে যেতে বললেন–এটা কি ঠিক ছিল?
হায়দার আকবর খান রনো: এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর খুব সাহসী সিদ্ধান্ত। তাঁর এমন অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত আছে। মনে আছে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা, তারিখটা মনে আছে, ১৯৭৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। কারণ, পরের দিন ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। উনি ডেকেছিলেন। আমাকে বাকশালে জয়েন করতে বলেছিলেন, আমাকে আর মেননকে। আমরা খুব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম। কারণগুলো তাঁকে বললাম। সেদিন কথায় কথায় উঠল যে ওআইসি, ইন্ডিয়ার সঙ্গে মেরিটাইম কী যেন..., তিনি বললেন, রাখ তোর মেরিটাইম ফেরিটাইম, সব দিতে হবে। আমি পাঞ্জাবি ক্যাপিটালিস্টদের তাড়িয়েছি, এর মানে এই না যে মাড়োয়ারি ক্যাপিটালিস্টদের আনতে হবে। তিনি বললেন, 'শোন, প্রেসিডেন্ট মনে করেন তাঁর পকেটে রাখবেন, ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন তাঁর আঁচলে বাঁধবেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানকে চেনে না। আই এম দ্য বর্ন লিডার, আমি কারও দ্বারা লেড হওয়ার লোক নই।' তবে দিস ইজ আ ফ্যাক্ট। এটা তাঁর কথার কথা নয়, তা বাস্তব সত্য। তিনি নেতা, তাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে ইন্দোনেশিয়ার লিডার সুকর্ন, আফ্রিকার ন্যালসন মেন্ডেলা, মিশরের নাসের অল দ্য ন্যাশনালিস্ট লিডার। এখানে একটা বিষয় দেখা যায় সেটা হলো, কিছু কিছু দেশে ওয়ান পার্টি সিস্টেম ছিল, যেমন: আলজেরিয়া। ওয়ান পার্টি সিস্টেম একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সেটাই ফলো করেছেন। কিন্তু এটা যে খুব কারেক্ট তা নয়, তা অনেক ঘটনায় প্রমাণিত।

বনশ্রী ডলি: জাসদের ভূমিকা কী ছিল, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য জাসদের কর্মকাণ্ড অনেকটা দায়ী, এমন কথাও বলা হয়?
হায়দার আকবর খান রনো: জাসদ তো বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। এদিকে বঙ্গবন্ধুকে যারা মারতে চেয়েছে, যে উদ্দেশ্যেই চেয়ে থাকুক, তারা এসবকে ব্যবহার করেছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

বনশ্রী ডলি: তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল?
হায়দার আকবর খান রনো: সেদিন আমি ছিলাম চট্টগ্রামে। কারফিউ দিল। পরদিন ঢাকায় আসি। হ্যাঁ, তেমন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয়নি। কাদের সিদ্দিকীসহ আরও কিছু মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। আমরা তেমন কিছু করিনি বা পারিনি। শেখ হাসিনা যখন দেশে আসেন, তিনিও বলেছিলেন–আপনারা কিছু করলেন না। তখন তাঁকে বলেছিলাম, এখনো বলছি–আমরা যখন রেডিয়োতে শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর কেবিনেটের অল দ্য মেম্বারস বা মন্ত্রীরা মোশতাকের কেবিনেট বা নতুন সরকারে শপথ নিয়েছে। এখানে আমরা তো বিরোধী দলে ছিলাম। আমরা প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়েছি, মিছিল করেছি, হরতালও করেছি। একটা বিরোধী দল যা করে, তা-ই করেছি। গণতান্ত্রিক পথে।

বনশ্রী ডলি: যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনা শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপ...
হায়দার আকবর খান রনো: দুটোই, দুটোর জন্যই স্যালুট বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে। বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, এটার ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অনেক বাধা ছিল। শেখ হাসিনা না থাকলে আওয়ামী লীগের অন্য কোনো নেতা এটা পারতেন না। নিশ্চিত বলতে পারি, একমাত্র তিনি বলেই পেরেছেন।

বনশ্রী ডলি: আপনি কি মনে করেন, পঁচাত্তরের পরের বাংলাদেশে, বামপন্থিদের সমন্বিত আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার ছিল?
হায়দার আকবর খান রনো: ছিল, উচিত ছিল। কিন্তু কী হলো! চীনপন্থির একটা বড়ো অংশ চলে গেল বিএনপিতে। মস্কোপন্থিদের বড়ো অংশ চলে গেল আওয়ামী লীগে। এমনকি মণি সিংহ যে পার্টির নেতা, সেই পার্টিও জিয়াউর রহমানের খাল কাটতে গেল!

বনশ্রী ডলি: ৫২ বছরে বাংলাদেশ কোন জায়গায়? বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, তা কতটা সফল?
হায়দার আকবর খান রনো: আমরা সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ চেয়েছিলাম। এখন সমাজতন্ত্রের ঠিক বিপরীতটা। ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গা থেকে বললে ধর্ম মৌলবাদের প্রতাপ চলছে। কী ভয়ংকর প্রতাপ মৌলবাদের। ইনোসেন্ট মানুষকে খুনখারাবি পর্যন্ত করছে তারা। একজন সংগীতপ্রিয় মানুষকেও তারা অনৈসলামিক বলে খুন করছে। একজন ফাদার খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করবে, এটা তাঁর অধিকার, তাঁকেও খুন করছে। এই যে সিরিজ খুন করল–মৌলবাদের উত্থান হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটা ক্রেডিট দিতে চাই, দেব, খুব বড়ো ক্রেডিট যে তিনি জামায়াতে ইসলামী বা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদের বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। উপযুক্ত দণ্ড পেয়েছে এরা। আই স্যালুট হার। এটা অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ বলব।

বনশ্রী ডলি: সংবিধানের চার মূলনীতির আলোকে বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় কী?
হায়দার আকবর খান রনো: সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেই শক্তি মৌলবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় থাকবে। যে শক্তি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, রক্ষা করবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের ন্যূনতম দাবি, এখানে এখনই তো সমাজতন্ত্র চাওয়া হচ্ছে না, তবে তাদের দাবিগুলোকে মেনে নেবে।

বনশ্রী ডলি: ফিরে আসি বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে, তাঁর বিশেষত্ব কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন...
হায়দার আকবর খান রনো: এককথায় বলতে গেলে তিনি ইতিহাসের মহানায়ক। এযাবৎকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো মহানায়ক তিনি। আর কী বলব!

সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্য উপেক্ষিত

শিবুকান্তি দাশ

সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের আয়না। এ আয়নায় ফুটে ওঠে স্ব-স্ব দেশের সার্বিক চিত্র। প্রতিদিন সকালে অনেকের অভ্যাস চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পত্রিকায় চোখ বুলানো। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, খেলাধুলা, গাঁও-গ্রামের খবরাখবর, বিনোদন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মুহূর্তে জানা যায় সংবাদপত্র পাঠে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সংবাদপত্র রয়েছে।

সংবাদপত্রকে একটি শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়। এ শিল্পে হাজার হাজার সাংবাদিক, সাহিত্যিক যেমন কাজ করেন, তেমনই অন্য লোকজনেরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে। পত্রিকাটি যখন পাঠকের কাছে পৌঁছে, নানা শ্রেণির পাঠক পত্রিকাটির দিকে দৃষ্টি ফেলেন। বাসাবাড়িতে পরিবারপ্রধান বাবা প্রথমে পত্রিকায় চোখ রাখেন। পরে বাড়ির অন্যরা যে যার পছন্দমতো পাতায় চোখ রাখেন। কিন্তু আমাদের দৈনিকগুলোয় বড়োদের জন্য অনেক বিষয় রাখা হলেও ছোটোদের জন্য তেমন কিছুই রাখা হয় না। ছোটোরা অনেকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী বলে তারা খেলার পাতাটি পছন্দ করে। তবে শৈশবে ছোটোদের কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ছড়া পড়া। বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় হতে হতে শিশু প্রথমে ছড়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। মজার মজার ছড়া পড়ে তারা বর্ণমালাটিও সহজে শিখে নেয়। শিখে নেয় গল্প পড়াও। মা, দাদা, দাদির মুখে ছড়া বা গল্প শুনতেই শিশু বেশি পছন্দ করে থাকে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে শিশু-

কিশোর প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। তারা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতিও আকৃষ্ট। একসময় গ্রামে মা, দাদা, দাদির মুখে ভূত-পেতনি রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনতে ভালো বাসত। বর্তমানে তারা ডোরেমন, টম অ্যান্ড জেরি, কার্টুন বা অন্য কিছুকে আপন করে নিচ্ছে।

আমাদের সংবাদপত্র শিশুদের বিভাগগুলোয় যুগের চাহিদা যেমন মেটাতে পারছে না, তেমনই একধরনের অবহেলাও লক্ষ করা যাচ্ছে। কোনো কোনো পত্রিকায় শিশুবিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অনেক পত্রিকায় বন্ধ রয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু আমাদের পত্রিকাগুলোর অতীত ইতিহাস ছিল এক্ষেত্রে খুবই উজ্জ্বল। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান ভাগপূর্ব এবং একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, শিশুর মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাচর্চার জন্য পত্রিকাগুলোর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সেই সময়কার দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ, গণকণ্ঠ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক পূর্বদেশসহ অনেক পত্রিকার নাম বলা যায়। এই পত্রিকাগুলোয় ছুটির দিনে শিশুদের সাহিত্য বিভাগ চালু ছিল। এ বিভাগে শিশু-কিশোরদের লেখা ছড়া, আঁকা ছবি, বিনোদন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ফিচারসহ লেখা থাকত। এ বিভাগগুলোয় লিখে এবং এঁকে আজকের খ্যাতিমান অনেক শিশুসাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছে। এখানে দৈনিক ইত্তেফাকের কথা উল্লেখ করতেই হয়, এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া দৈনিক ইত্তেফাকে কচি-কাঁচার আসর প্রতিষ্ঠা করে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। পত্রিকাগুলোর উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য বিভাগ ছিল দৈনিক ইত্তেফাকে কচি-কাঁচার আসর, সংবাদে 'খেলাঘর', আজাদে 'মুকুলের মহফিল', দৈনিক বাংলায় 'সাত ভাই চম্পা' ইত্যাদি নামে পরিচালিত হতো। পরবর্তী সময়ে এ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সারা দেশের শিশু-কিশোরদের সংগঠিত করে তাদের সৃজনশীল-মননশীল চর্চার দ্বারকে আরও বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। এ সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সারা বছর চলত নানা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এসব সংগঠনের কর্মীদের অনেকে কিশোর যোদ্ধা হিসাবে অংশ নিয়ে শহিদও হয়েছেন। তাদের সেভাবে তৈরি করার প্রয়াস ছিল সংগঠনগুলোর। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে বীজ বপন করা হয়েছিল। সেটা শিশুসাহিত্য বা শিশু বিভাগগুলোর অবদান।

আজ আমাদের দৈনিকগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, স্বাধীনতাপূর্ব বা পরবর্তী সময়ে দৈনিকগুলো যে নীতি, আদর্শ ধারণ করে পথ চলে আসছিল, তা বর্তমানে তিরোহিত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দৈনিকগুলোয় শিশু-কিশোররা একধরনের উপেক্ষিত। দৈনিক যুগান্তর তার শিশুবিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, আমাদের সময়, বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ কিছু পত্রিকা অর্ধেক পাতায় নামিয়ে এনেছে। যদি কোনো বিশেষ 'ক্রোড়পত্র' বা বড়ো কোনো বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, কর্তৃপক্ষ শিশু বিভাগটির দিকেই তির ছোড়ে। শিশুপাতাটি ওইদিন আর বের হয় না। অথচ সেই বিভাগের খুদে যে পাঠক, তার কথাটা ভাবা হয় না।

সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্য উপেক্ষিত। এতে আমাদের শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা চর্চায় বাধা হচ্ছে কি-না, হলে উত্তরণের উপায় কী। এ বিষয়ে দেশের কয়েকজন বরেণ্য শিশুসাহিত্যিক, শিল্পীর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও করণীয় নিয়ে। তাঁরা হলেন সেলিনা হোসেন, হাশেম খান, আসলাম সানী, আমীরুল ইসলাম, সুজন বড়ুয়া, ড. তপন বাগচী, আশরাফুল আলম পিন্টু ও মালেক মাহমুদ।

সেলিনা হোসেন, কথাসাহিত্যিক

আমাদের দৈনিকগুলোয় শুধু শিশুসাহিত্য নয়, শিশুকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। আমাদের বেশির ভাগ দৈনিকে শিশুর জন্য কোনো আলাদা পাতা রাখে না। কিছু দৈনিকে শিশুসাহিত্যের পাতা দেখা গেলেও এখন তা হয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, নয়তো জায়গা কমিয়ে ছোটো করে দেওয়া হয়েছে। ফলে দায়সারাভাবে শিশুসাহিত্যের পাতাটা বের হতে দেখি। শিশুসাহিত্য ছাড়াও শিশুকে অনুপ্রাণিত করতে তাদের উপযোগী অনেক বিষয় আছে, যা ছাপা হলে শিশু পড়ে আনন্দ লাভ করবে। সেই আনন্দের ধারাবাহিকতায় শিশু শিখবে, লিখবে এবং তারাই তো বড়ো হয়ে বড়োদের সাহিত্য লিখবে। এখানে তাদের বড়ো হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

শিশুরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের যদি শৈশব থেকে গড়ে তোলা না হয়, সৃজনে-মননে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে না দেওয়া হয়, তারা বিপথগামী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দায়িত্বশীলতার জায়গা। মালিকপক্ষ ব্যাবসা করলেও এ জায়গাটা একটু অন্যরকম। একসময় সংবাদপত্র সেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে।

প্রতিদিনের দৈনিকে আমরা খেলাধুলা, বড়োদের বিনোদন, অর্থনীতি ও ধর্মীয়-রাজনীতির সব খবর পেয়ে থাকি। কিন্তু শিশুর জন্য নেই বিনোদন, নেই সাহিত্য।

আমরা চাই, প্রতিদিন শিশুর জন্য একটা ঝলমলে পাতা। যেখানে শিশু লিখবে, আঁকবে। শিশুর কৃতিত্বের খবর থাকবে, যা দেখে অন্য শিশুরা অনুপ্রাণিত হবে। শিশুর আঁকা, লেখার পাশে থাকবে তার হাসিমাখা ছবি। শিশুপাতায় থাকবে সাহিত্যের ভালো বইয়ের খবর। থাকবে প্রবীণ লেখকদের প্রেরণামূলক লেখা। এ দায়বদ্ধতা সংবাদপত্র কোনোভাবে এড়াতে পারে না। সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ শিশুর মানস গঠন, দেশের ভবিষ্য নাগরিকদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে বড়ো মন নিয়ে এগিয়ে আসবে, সেদিনের অপেক্ষায় আমরা।

হাশেম খান, চিত্রশিল্পী

শিশুকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, তাদের সৃজনশীল, মননশীলচর্চা–সর্বোপরি শিশুর মানস গঠনে আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলোর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যৎ এই শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অতীতে। আমরা দেখেছি, সেই চল্লিশের দশক থেকে সর্বশেষ আশির দশক পর্যন্ত সংবাদপত্রে বিভিন্ন নামে শিশুসাহিত্যের বিভাগ চালু ছিল এবং বিভাগগুলোকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হতো। স্কুল ছুটির দিনে শিশুদের বিভাগটি ছাপা হতো। আমিও আমার শৈশবে এই পাতাগুলো পড়ে দারুণভাবে আনন্দ উপভোগ করতাম। প্রতি সপ্তাহে দৈনিক আজাদ পত্রিকার মুকুলের মহফিল, দৈনিক ইত্তেফাকে কচি-কাঁচার আসর, সংবাদে খেলাঘর, দৈনিক পূর্বদেশের চাঁদের হাট নামে শিশুদের বিভাগ ছিল।

পরবর্তী সময়ে এই বিভাগগুলোকে সংগঠনে রূপ দিয়ে সারা দেশে শিশু-কিশোরদের দৈহিক-মানসিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিশুসাহিত্য সম্পর্কে জানা, বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ তাদের মধ্যে বপন করা, স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে জানানোর কাজটিও সুকৌশলে করা হয়েছিল। এসব কাজে সর্বাধিনায়ক হিসাবে ছিলেন চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান। শিশুকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গড়ে তোলার কাজ তাঁরা করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সেই ১৯৪৬-৪৭ সালে 'মুকুল ফৌজ'-এর সদস্যরা আন্দোলনে কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন।

> আমরা চাই, প্রতিদিন শিশুর জন্য একটা ঝলমলে পাতা। যেখানে শিশু লিখবে, আঁকবে। শিশুর কৃতিত্বের খবর থাকবে, যা দেখে অন্য শিশুরা অনুপ্রাণিত হবে। শিশুর আঁকা, লেখার পাশে থাকবে তার হাসিমাখা ছবি। শিশুপাতায় থাকবে সাহিত্যের ভালো বইয়ের খবর। থাকবে প্রবীণ লেখকদের প্রেরণামূলক লেখা। এ দায়বদ্ধতা সংবাদপত্র কোনোভাবে এড়াতে পারে না

সেসময় বেগম পত্রিকা ও সওগাত পত্রিকায় 'শিশুসওগাত' প্রকাশ হতো। তাতে লিখতেন হাবীবুর রহমান, আহসান হাবীব, রোকনুজ্জামান খানসহ কলকাতার গুণী লেখক-শিল্পীরা।

১৯৫৬ সালের অক্টোবরে শিশু দিবসে কচি-কাঁচার আসরের জন্ম হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা জাঁদরেল সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কচি-কাঁচার আসর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিশুবিভাগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। প্রতি সপ্তাহে দুই পাতায় রঙিন 'কচি-কাঁচার আসর' বের হতো। বিভিন্ন দিবসে ইস্যুভিত্তিক চার পাতার 'ক্রোড়পত্র'ও বের হতো কচি-কাঁচার আসরের। কচি-কাঁচার আসরের পরিচালক ছিলেন রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছোটোদের খুবই ভালোবাসতেন। শিশুদরদি ছিলেন। তিনি ইত্তেফাকে কচি-কাঁচার মেলার জন্য একটি রুম দিয়েছিলেন। তখন একতলা বিল্ডিং। অনেক খ্যাতনামা সাংবাদিক সেখানে কাজ করতেন। তাঁদের বসার জায়গা হতো না। পরে কচি-কাঁচার মেলার জন্য দুটি ঘর বরাদ্দ দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। আমরা সাহিত্য সভা করতাম ছাদে। বৃষ্টির জন্য সেখানে সভা করতে পারছি না জেনে মানিক ভাই নিজের 'খাসকামরা'য় সভা করতে বলে দিলেন। এমন মানুষ কি আর পাওয়া যাবে?

সেদিনের ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার মাধ্যমে আজকের দিনের অনেক খ্যাতিমান লেখক, শিল্পী, খেলোয়াড়, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছেন।

আমীরুল ইসলাম, শিশুসাহিত্যিক ও মিডিয়া সংগঠক

যে কোনো পত্রিকাই সামাজিক-রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যাবসা করে। ছোটোদের জন্য কোনো পাতা থাকা-না-থাকা বা না থাকার ব্যাপারে মালিকের মতামতই চূড়ান্ত। আমি মনে করি, দৈনিক পত্রিকায় ছোটোদের পাতা নতুন লেখকদের প্রেরণা দেওয়া ছাড়া আর কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

ছোটোদের পাতা ছোটোরা কী পরিমাণ পড়ে, তা নিয়েও আমার সংশয় আছে। দৈনিক পত্রিকায় ছোটোদের পাতা না থাকলেও তাতে শিশুসাহিত্যের কোনো লাভ বা ক্ষতি হয় না। পৃথিবীর অনেক দেশের পত্রিকায় ছোটোদের বিভাগ থাকে না। তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

ছোটোদের পাতার নিদিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। ছোটোদের বিষয় মানে কিছু ছড়া-কবিতা-গল্প নয়। শিশুসাহিত্যের পরিধি ব্যাপক। এর কিছু ছায়া খুঁজে পাই প্রথম আলোর 'গোল্লাছুট' আর সমকালের 'ঘাসফড়িং'-এ। হয়তো ভিন্নধর্মিতার কারণে ছোটোরা এ দুটি পাতার জন্য অপেক্ষা করে; কিন্তু অন্যান্য পত্রিকার পাতা অসম্ভব দায়সারাভাবে প্রকাশিত হয়। আজকাল ছোটোদের পাতায় সৃজনশীল সাহিত্যের বড়ো অভাব। একটু বড়ো লেখা দিলে বলেন, কেটে ছোটো করে দিন। কিংবা বলে থাকেন, এ সংখ্যায় তো অনেক ছড়া ছাপাব, একটা ছড়া দিন। এজন্য মনে করি, শিশুসাহিত্যের প্রকৃত চর্চার স্থান হচ্ছে সাহিত্য বা লিটল ম্যাগাজিন। ষাটের দশকের কচি-কাঁচা কিংবা টাপুর-টুপুর, সত্তরের দশকে শিশু, নবারুণ ও ধান শালিকের দেশ। এরা প্রচুর শিশুসাহিত্য ছেপেছে। এখন অনেক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় শিশুসাহিত্যনির্ভর। শিশুসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'শিশুসাহিত্য সারথি'। খুবই উন্নত মানের কাগজ। এখন লিটল ম্যাগাজিনগুলো আধুনিক চিন্তাভাবনা ধারণ করছে। অনেক নতুন চিন্তাধারক এসব লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনায়। দৈনিক পত্রিকার পাতায় যেসব লেখা ছাপা হওয়া সম্ভব নয়; মালিক, সম্পাদক, উপসম্পাদক অনেকের মতামত সেখানে যুক্ত হয়। এজন্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া উপায় নেই। কিছু দিন ধরে নীরবে এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

এখন লেখা প্রকাশের আরেকটা মাধ্যম ডিজিটাল প্ল্যাটফরম। সেখানে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। সরাসরি ভালোমন্দ মন্তব্য জানা যাচ্ছে। সেখানে পত্রিকার ভূমিকা অনেকটা গৌণ হয়ে যাচ্ছে। অনলাইনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে অনলাইনের ছোটোদের পাতাও জনপ্রিয় হবে–সেটাই স্বাভাবিক।

বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। পরিবর্তনের ছোঁয়া আমাদের মেনে নিতে হবে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ছোটোদের পত্রিকা নবীন লেখকদের উৎসাহদান ছাড়া আর কোনো ভূমিকা রেখেছে কি? হুমায়ূন আহমেদ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, শওকত আলী, সৈয়দ শামসুল হক, রাহাত খান প্রমুখের লেখা ছোটোদের পাতায় নিয়মিত পড়েছি কি? কখনোই না।

শিশুসাহিত্যচর্চা ছোটোদের পাতাকে কেন্দ্র করে আর কী হবে। প্রথম আলো ইদানীং কিশোর আলো নামে একটি আলাদা পত্রিকা বের করে। কিশোর আলো বরং শিশুসাহিত্যের সেবা করে যাচ্ছে।

প্রকৃত লেখক কখনো পত্রিকার পলিসির সঙ্গে নিজেকে বিলীন করেন না। তাঁরা তাঁদের স্বকীয়তা নিয়ে লিখে যান। সাহিত্যের জয়পতাকা সেখানেই উড়তে থাকে।

আসলাম সানী, শিশুসাহিত্যিক

বর্তমান সময়কালটা বিজ্ঞানের। প্রযুক্তির উচ্চশিখরে অতিবাহিত হচ্ছে। মানুষ সভ্য হলে আলোকরেখা ফুটে উঠবে। শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হলে তার চিন্তাচেতনাও উন্নত হয়। আমাদের সময় শৈশবে পড়ে ছিলাম

'পাখি সব করে রব...' কিংবা 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজন...।'

আজকের দিনে সেই নীতিকথার ছড়া বা কবিতা কই। আমাদের শিশুসাহিত্যিকরা কি সেই লেখা লিখতে পারছেন? কিংবা যাঁরা পত্রিকার পাতা দেখার দায়িত্ব নেন, তাঁরা কি জানেন? শিশুসাহিত্য কি তা বুঝেন? একসময় দৈনিক বাংলায় ছোটোদের পাতা ছিল 'সাত ভাই চাম্পা'। ছোটোরা যাতে লেখাটি পড়তে আগ্রহী হয়, এজন্য এত বড়ো একটি ছবি এঁকে তার পাশে ছড়াটি ছেপে দিয়েছেন। কী অসাধারণ সে কাজ ছিল। আজকের দিনের বিভাগীয় সম্পাদকরা অনেকেই নিজেরাই ভালো লেখক না। তাঁদের সঙ্গে কি লেখকদের যোগাযোগ আছে? লেখা চেয়ে আনতে পারেন?

বিজ্ঞাপন এলে প্রথমে শিশুসাহিত্যের পাতার ওপর হামলে পড়ে কর্তৃপক্ষ। সরকারি বা কোনো ক্রোড়পত্র এলে সেটা শিশুসাহিত্যের পাতাটি যদি ওইদিন থাকে, সেটা বিজ্ঞাপন দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়। মালিকরা চাইলে তো প্রতিদিন শিশুদের জন্য একটি পাতা রাখতে পারেন। শিশুরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের গড়ে তুলতে হলে পত্রিকায় শিশুসাহিত্যের পাতা থাকাটা খুব দরকার।

একসময় পত্রিকাগুলোয় শিশুদের পাতার দায়িত্বে ছিলেন হাবীবুর রহমান, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, বজলুর রহমান (ভাইয়া)। তাঁরা শিশুসাহিত্যিক, লেখকদের চিনতেন। পত্রিকায় পাতায় কার লেখা আগে যাবে, কারটা পরে, তা ঠিক করে ছাপাতেন। আমি মনে করি, শিশুর সৃজনশীলতা, মননশীলতার জন্য মানসম্পন্ন শিশুতোষ পাতা করার কোনো বিকল্প নেই।

সুজন বড়ুয়া, শিশুসাহিত্যিক ও সম্পাদক শিশুসাহিত্য সারথি, ঢাকা

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্য চরমভাবে উপেক্ষিত। শিশুসাহিত্যের জন্য সংবাদপত্রগুলোর আনুকূল্য, পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিকতা মোটেও উল্লেখ করার মতো নয়। শিশু অবোধ-অবুঝ, সেই সুযোগে সংবাদপত্রের কোনো বরাদ্দ কমানো বা বাতিলের প্রশ্ন উঠলে প্রথম দফায় কোপ পড়ে ছোটোদের পাতার ওপর। বড়োদের সাহিত্য সাময়িকীর জন্য যেখানে নিয়মিত প্রায় জাতীয় দৈনিকে দুই পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে, সেখানে অনেক জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ছোটোদের জন্য সাপ্তাহিক কোনো পাতাই রাখে না। মানে, রাখার প্রয়োজন মনে করা হয় না। আবার সর্বাধিক প্রচারসংখ্যার দৈনিক পত্রিকাও কোনোমতে নামমাত্র অর্ধেক পৃষ্ঠা বরাদ্দ রাখে। কোনো কোনো সপ্তাহে তা এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠাও হয়ে যায়। যুগান্তরের মতো জাতীয় দৈনিক 'আলোর নাচন' শীর্ষক জনপ্রিয় ছোটোদের পাতা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য যেসব সংবাদপত্র সীমিত সাধ্যে নিয়মিত ছোটোদের পাতা পরিবেশন করে, তাঁদের আয়োজনকে আমি খাটো করে দেখছি না। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি রেখেই বলছি, প্রতিটি সংবাদপত্রের কাছে আমার দাবি– সপ্তাহে অন্তত এক পৃষ্ঠা ছোটোদের বরাদ্দ রাখুন। সংবাদপত্র হলো দেশ ও সমাজের প্রথম দর্পণ। এই দর্পণে প্রতিদিন যেন শিশুর ঝলমলে রঙিন মুখও দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্যের বর্তমান সামগ্রিক চিত্র শিশুদের প্রতি অবহেলার করুণ উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আজকের শিশুসাহিত্যের পাঠকই আগামী দিনে সংবাদপত্র ও বড়োদের সাহিত্যের পাঠকে পরিণত হবে। শিশুসাহিত্য হলো সেই সাহিত্য, যা শিশুর ইতিবাচক মানসগঠনে ভূমিকা রাখে। শিশুসাহিত্য শিশুকে দেশ-কাল-জীবন-সমাজ-ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, মানবিক বোধসম্পন্ন বিজ্ঞানমনস্ক দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। শিশুসাহিত্য পড়তে পড়তেই শিশু-কিশোররা সৃজনশীল হয়ে ওঠে। সুতরাং সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্য উপেক্ষিত হলে শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলচর্চায় অবশ্যই প্রভাব পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে শিশুসাহিত্যের দৈন্য চিত্র পালটানোর জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ ও নীতিনির্ধারকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আজকের শিশু জাতির আগামী দিনের কর্ণধার–এই আপ্তবাক্য শুধু মুখে নয়, কাজে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে, প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। এর অন্যথা হলে জাতির সৃজনশীলতা বিকশিত হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে অচিরেই সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হবে।

ড. তপন বাগচী, ছড়াকার ও কবি, উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় শিশুসাহিত্য উপেক্ষিত, এই মন্তব্য উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। শিশু-কিশোরদের মানসগঠনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ার কথা ভাবার আগে দেখতে হবে এই পৃষ্ঠাগুলো আমাদের শিশু-কিশোররা পাঠ করে কি না। একসময় কচি-কাঁচার মেলা শিশু-কিশোর সংগঠনের পৃষ্ঠা ছিল দৈনিক ইত্তেফাকে, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের পৃষ্ঠা ছিল দৈনিক সংবাদে। এসব শিশু-কিশোর সংগঠন বিস্তৃত ছিল সারা দেশে। তাদের কর্মকাণ্ড ছিল বছরব্যাপী। তাঁদের কাজের খবর ছাপা হতো শিশু-কিশোর পৃষ্ঠায়। আর ওইসব পৃষ্ঠা সম্পাদনা করতেন ওইসব সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট গুণীরা। কচি-কাঁচার আসর সম্পাদনা করতেন রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই) আর খেলাঘর সম্পাদনা করতেন বজলুর রহমান (ভাইয়া)। ওই সময় বিভিন্ন পত্রিকায় যাঁরা শিশু-কিশোর পৃষ্ঠা দেখতেন, তাঁদের মধ্যে আফলাতুন, রফিকুল হক দাদুভাইয়ের নাম মনে পড়ছে। তাঁরা শিশুদের জন্য লিখতে, শিশুদের মননবিকাশে নিবেদিত সংগঠন পরিচালনা করতেন। শিশুর মনস্তত্ব তাঁরা বুঝতেন। তাই এসব পৃষ্ঠার পাঠক ছিল শিশু-কিশোর। কিন্তু এখন সেই ধারা বদলে গেছে। এখন শিশু-কিশোর পৃষ্ঠা প্রকৃত শিশু-কিশোর সংগঠক কিংবা খ্যাতিমান সাহিত্যিকের হাতে নেই। পত্রিকাগুলোও দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করে মাত্র। এর থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে সারা দেশে শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া এবং পৃষ্ঠাটি তাদের মনোনীত সংগঠক ও সাহিত্যিকের হাতে তুলে দেওয়া।

আনোয়ার হোসেন পিন্টু, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

আমরা বলি পত্রিকা সমাজের দর্পণ। পত্রিকার মালিক বলেন, আমি ব্যাবসা করতে এসেছি। আমার বিজ্ঞাপন দরকার। আমাকে লাখপতি-কোটিপতি হতে হবে। অন্য সবকিছু গোল্লায় যাক।

আমি চট্টগ্রামের শীর্ষ দৈনিক পূর্বকোণে ৩০-৩৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতায় ঘটনাচক্রে ১৫ বছর মেয়েদের পাতা দেখতে হয়েছে। সপ্তাহে তিনটি পাতা আমাকে দেখতে হতো। পূর্বকোণে শিশুপাতা 'কলরোল' সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখি শুধু ছড়া আসে ই-মেইলে। আমি একটু ভিন্ন চিন্তা করলাম। খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে লেখা নিয়ে কলামের মতো করে ছাপাব। কয়েকজনের কাছে লেখা চাইতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। 'যখন আমি ছোটো ছিলাম'–এই শিরোনামে লেখা হবে। কেউ রাজি হননি। দুই একজন লিখবেন বলেও সময় নিয়ে নিয়ে আর লেখা দেননি।

পূর্বকোণের শিশুসাহিত্যের পাতা 'কলরোল' তিন বছর ট্যাবলয়েড আকারে বের করেছি। ম্যাগাজিন আকারে বের করারও পরিকল্পনা

দৈনিকগুলোর পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ ও সংবাদে একসময় ছোটোদের সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করতেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকরা। শুধু তাই নয়, সাহিত্য পাতাগুলোকে কেন্দ্র করে সারা দেশে গড়ে উঠেছিল খেলাঘর, কচি-কাঁচার আসর, মুকুল ফৌজ নামের নানা শিশু-কিশোর সংগঠন

ছিল। কিন্তু ভালো লেখা শিশুসাহিত্যিক বা বড়োদের লেখকদের কাছ থেকেও পাইনি। বাধ্য হয়েই বেনামেও লিখেছি। তাতে যে অভিজ্ঞতা হলো, যাঁরা শিশুসাহিত্যের সঙ্গে জড়িত, তাঁদেরও লেখাপড়ার ঘাটতি রয়েছে। খুব কম পেয়েছি চট্টগ্রামে শিশুসাহিত্যের ভালো লেখক।

আগে আমাদের ছোটোবেলায় বাপ-চাচাদের দেখতাম বই পড়তে। এখন তো মা-বাবাও বই পড়ে না, সন্তানরাও বই পড়াতে আগ্রহী না।

সন্তানদের গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবকদের। তাঁরাও হয়ে গেছেন অন্যরকম। শুধু পরীক্ষার জন্য বই পড়া। যে কোনোভাবে পাশ করা চাই। ৫-১০ বছর পর ছোটোদের সাহিত্য পাতা থাকবে কি না সন্দেহ। কারণ, আমরা এখন ফেসবুকে বেশি সময় কাটাই। কিন্তু ইন্টারনেট থেকে ভালো জিনিসগুলো খুঁজে পড়ি না।

উত্তরণ হবে কীভাবে। কেউ তো বই পড়ছি না। বাচ্চার জন্মদিনে খেলনা উপহার দিই, বই তো কেউ দিই না। উপহার হিসাবে বইকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণীতে বইকে বেছে নিতে হবে। ভালো বই শিশুর জীবন বদলে দিতে পারে। অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে।

আশরাফুল আলম পিন্টু
শিশুসাহিত্যিক ও সম্পাদক, শিশু-কিশোর সাময়িকী 'কিশোর', ঢাকা

শুধু শিশুসাহিত্য নয়, আমাদের দৈনিকগুলোয় শিশুরাই তো উপেক্ষিত। সকালে যখন কোনো বাসায় পত্রিকা পৌঁছে, বড়োরা সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পরিবারের শিশুটির জন্য তো পত্রিকায় কিছুই থাকে না। যা থাকে সংবাদ প্রতিবেদন, খুন-খারাবি, খেলাধুলা, নারী পাতা, বড়োদের বিনোদন। তারপর ভারী ভারী কথায় সম্পাদকীয়। তবুও যখন পরিবারের শিশুটি পত্রিকাটা হাতে নিতে চায়, তাকে দেওয়া হয় বাধা। এভাবে শিশু পরিবারেই উপেক্ষিত।

আমি একটি দৈনিকে কাজ করার সময় কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পেরেছিলাম প্রতিদিন একটি শিশুপাতা রাখার জন্য। কর্তৃপক্ষ শিশু কর্নার নামে ছোটো করে জায়গা দিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল তাতে প্রতিদিন শিশুর আঁকা ছবি, ছড়া, বিজ্ঞান, কমিক্স থাকবে। এসব একাডেমি শিক্ষা নয়, টিউটোরিয়ালও নয়। শিশুর বিনোদন হিসাবে থাকবে। দেশ-বিদেশের শিশুবিষয়ক খবরাখবর থাকবে। কর্তৃপক্ষ তা লুফে নিয়েছিল। এক, দুই কলামের শিশু কর্নারও চালু করেছিলাম।

দৈনিকগুলোর পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ ও সংবাদে একসময় ছোটোদের সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করতেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকরা। শুধু তাই নয়, সাহিত্য পাতাগুলোকে কেন্দ্র করে সারা দেশে গড়ে উঠেছিল খেলাঘর, কচি-কাঁচার আসর, মুকুল ফৌজ নামের নানা শিশু-কিশোর সংগঠন। এগুলোর মাধ্যমে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন হতো। তাতে ছোটোদের জন্য থাকত শরীরচর্চা থেকে নানাবিধ পর্ব। এসবের সঙ্গে অভিভাবকরাও যুক্ত হতেন। স্বাধীনতার পর থেকে ৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। এর প্রভাব তো সমাজে পড়ে।

আমাদের সময়ে অনেক খ্যাতিমান শ্রদ্ধেয় লেখক, সংগঠককে পেয়েছি, তাঁরা কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজগুলো করতে পেরেছেন। এখন অনেক পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিশুদের পাতাও বন্ধ। দৈনিক বাংলা যখন বন্ধ হয়ে গেল, 'সাত ভাই চাম্পা'ও বন্ধ হয়ে যায়।

আরেকটা বিষয়, দাদাভাই, দাদুভাই যখন পাতা দেখতেন, কর্তৃপক্ষের কোনো খবরদারি ছিল না। বর্তমানে বিভাগীয় সম্পাদকদের আস্থায় নিতে পারছেন না। তাদের ওপর নানা নির্দেশনা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তখন ওই সম্পাদকের কিছু করার থাকে না। ফলে ছোটোদের পাতা হয় উদ্দেশ্যহীন।

আমি প্রতিদিন শিশুদের পাতা করতে চেয়েছিলাম। সাপ্তাহিক সাহিত্য পাতা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি।

বড়োদের সাহিত্য পাতায় কি বিজ্ঞানের কোনো খবর যায়? আঁকা ছবি ছাপা হয়? থাকে বই আলোচনা বা গল্প। কিন্তু ছোটোদের সাহিত্য পাতা হবে না কেন? ছোটোরা কি পাঠক নয়?

আজ নিরঙ্কুশ শিশুসাহিত্য পাতা চোখে পড়ে না। যা হয় পাঁচ মেশালি। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ মনে করেন শিশুসাহিত্য পাতা না থাকলে কিছু যায় আসে না।

বর্তমানে অনেক প্রযুক্তি এসে গেছে। শিশুসাহিত্যের উপেক্ষার জায়গা থেকে সরে আসতে হবে। আর যারা শিশুসাহিত্যের পাতা পরিচালনা করেন, তাদের ইতিবাচক হতে হবে।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট সবাই এগিয়ে আসবেন ইতিবাচকভাবে, তাতে আবার ঝলমল করে উঠবে আমাদের শিশুসাহিত্য, পত্রিকা পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠবে শিশুরা।

লেখক: সাংবাদিক

মৃত্যুঞ্জয়ী সাংবাদিক জুলিয়াস ফুসিক

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান

আহ্সান উল্লাহ্

১৯৪৩ সাল। ইউরোপে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। জার্মানিতে নাৎসি সরকারের সর্বেসর্বা একনায়ক হিটলারের একচ্ছত্র আধিপত্য। সমগ্র ইউরোপজুড়ে যুদ্ধের তাণ্ডব। সেই সময় ১৯৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বার্লিনের কারাগারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে চেকোস্লোভাকিয়ার খ্যাতিমান, মেধাবী এবং মার্কসবাদী বিপ্লবী সাংবাদিক জুলিয়াস ফুসিকের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। নাৎসি কারাগারে বিচার চলাকালে, যতদিন আটক ছিলেন; সেই সময় তিনি সিগারেটের প্যাকেটের কাগজে দ্রুততার সঙ্গে তার ক্ষুরধার লেখনী পরিচালিত করেন। তার প্রতি সহানুভূতিশীল দুজন জার্মান কারারক্ষীর মাধ্যমে সেই লেখাগুলো বাইরে পাঠাতে সক্ষম হন ফুসিক। পরবর্তী সময়ে তার ওই লেখাগুলো 'রিপোর্ট ফ্রম দ্য গ্যালোজ' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৯০টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর তার লেখনী এবং শ্রমিকশ্রেণির জন্য শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রতি তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জুলিয়াস ফুসিককে মৃত্যুঞ্জয়ী খ্যাতি এনে দেয়।

নাৎসি কারাগারে জুলিয়াস ফুসিককে ফাঁসি দেওয়া হলেও এই সাংবাদিকের দূরদৃষ্টি, মেধা, শ্রমিকশ্রেণির জন্য শোষণহীন শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম তাকে চিরঞ্জীব খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাকে হত্যা করা হলেও তার কর্মকে হত্যা করা যায়নি। পক্ষান্তরে

ফুসিকের হত্যাকাণ্ড তার হত্যাকারীদেরই নৈতিকতার ফাঁসিকাষ্ঠে চিরকালের জন্য ঝুলিয়ে দিয়েছে। তার হত্যাকারীরা সত্য প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী এক সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিককে হত্যা করে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিক এই সাংবাদিক ফাঁসির আগে নাৎসি কারাগারে আটকাবস্থায় লিখে যান 'রিপোর্ট ফ্রম দ্য গ্যালোজ'। যার বাংলা করলে বলা যায়, 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে প্রেরিত প্রতিবেদন'। তার এই রিপোর্ট সব যুগের সাংবাদিকদের জন্য শক্তিশালী উত্তরাধিকার। সাংবাদিক সমাজের জন্য এক দিকনির্দেশনা। 'রিপোর্ট ফ্রম দ্য গ্যালোজ'-এর মধ্যে আছে তার আত্মকথন এবং ফাঁসির বিষয়ে তার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

জুলিয়াস ফুসিক তরুণ পাঠক, শ্রোতা এবং পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য তার প্রেরণাদায়ী লেখনীতে শ্রমিকশ্রেণির অধিকার, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ এবং যে কোনো ধরনের অমানবিক সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা–এসব নিয়ে যে বার্তা দিয়েছেন তা আজও মুক্তিকামী মানুষের জন্য সমান প্রাসঙ্গিক।

সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও উল্লিখিত ধরনের কাজ ও দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ করে। একজন সাংবাদিক যিনি দৈনন্দিন সমস্যাবলি নিয়ে কাজ করেন, দিনের পর দিন একের পর এক সমস্যা আসতে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে পূর্বকার সমস্যা বর্তমানের সমস্যার অন্তরালে চাপা পড়ে যায়। নতুন ঘটনাবলি নিয়ে নতুন কিছু বলার থাকলে দীর্ঘদিন পর কোন সুস্পষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করে রাখে?

ফুসিকের প্রবন্ধাবলি, চিন্তাচেতনা, তার রিপোর্ট, তর্কবিতর্ক দীর্ঘদিন আগের বিষয় হলেও মনে হয়–ফুসিক আমাদের বর্তমান সময়ের সমস্যাবলি নিয়েই কথা বলছেন। মনে হয়, তিনি এ বিষয়গুলো ভালো জানেন, বোঝেন–ওই বিষয়ে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করছেন। সেই সঙ্গে থাকছে সমালোচক হয়ে সতর্কীকরণ এবং প্রয়োজনমতো অনুপ্রেরণাদায়ক উৎসাহ প্রদান। এর কারণ কী? কীভাবে সম্ভব!

এ ব্যাপারে প্রাগের চার্লস ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের ডিন অব ফ্যাকাল্টি প্রফেসর ড. ভ্লাদিমির হুডেক বলেছেন, আমি সুনির্দিষ্টভাবে ফুসিকের বিশেষ একটি প্রবন্ধের উদাহরণ টানব। 'থ্রি পাথস অ্যান্ড ওয়ান ফ্রন্ট' নামের প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালের ২৭ জুলাই চেকোস্লোভাকিয়ার 'ভোরবা' ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের বিষয় নিয়ে বিপ্লবী সাংবাদিক ফুসিক সুচিন্তিত এবং দূরদৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ওই সময় হিটলারের ক্ষমতা দখল কী ভয়াবহ পরিণতি বিশ্বের জন্য ডেকে আনছে, তা ইউরোপের বা বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি এক আশ্চর্য দূরদৃষ্টি নিয়ে লিখলেন, 'আগামী ১০ বছরে কী ভয়াবহ আত্মঘাতী ঘটনাবলি ঘটতে যাচ্ছে, তাকে (হিটলার) যারা ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছে, তা তারা বুঝতে পারছেন না।'

তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অমোঘ। এটা ছিল তার দিব্যদৃষ্টি। এমনকি ওই ১০ বছরে যে লাখ লাখ লোক প্রাণ হারান, তার মধ্যে জুলিয়াস ফুসিকও ছিলেন।

ফুসিক তার উপরিউক্ত প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জার্মানির ফ্যাসিস্ট সরকার; ভবিষ্যতে তাদের সমর্থকরা যে কোনো ধরনের গুরুতর অপরাধ করলেও ফ্যাসিস্ট আদালতে তাদের বিচার হবে না। ফুসিক তার প্রবন্ধে আদালতে ফ্যাসিবাদী অপরাধীদের বিচারের যে চিত্র এঁকেছেন তা এমন–'না, আমি কোনো অপরাধ বা দুষ্কর্ম করিনি। আমি বৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছি এবং জার্মান গণতন্ত্রের আইন ও নিয়ম অনুযায়ী বৈধভাবেই দেশ শাসন করছি। আমি বিশেষ সময়ের জার্মান গণতন্ত্রের প্রতিনিধি...অতঃপর আদালতে সাময়িক বিরতি দেওয়া হবে। বিরতির পর ঘোষিত রায়ে বলা হবে, আপনি নির-পরাধ। আপনাকে সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। আপনি মুক্ত, শান্তিতে বসবাস করুন। রাষ্ট্র আপনাকে পেনশন মঞ্জুর করবে।'

ফুসিকের এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। তিনি ভিয়েতনাম, ইসরাইলি হামলা–এসব ব্যাপারেও বহু আগে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার ১৯৩৪ সালের লেখায়।

ওইরূপ দীর্ঘ সময় আগে ফুসিক কীভাবে আগামী দিনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার সিদ্ধান্তের কথা লিপিবদ্ধ করেন? এটা কীভাবে সম্ভব?

একজন সাংবাদিকের অসাধারণ সহজাত জ্ঞানগরিমা, মেধা ও দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে ও বুঝতে পেরেছিলেন। ফুসিক মার্কসবাদী ছিলেন এবং মার্কসবাদকে তিনি বিজ্ঞান হিসাবেই গণ্য করতেন। এই বিষয়টি তিনি গভীরভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। তার রিপোর্ট এবং লেখালেখির মধ্যে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৩৪ সালে হিটলার এবং নাৎসি জার্মানির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও স্বচক্ষে দেখার জন্য ফুসিক চেকোস্লোভাক-জার্মান সীমান্তের সুমাভা পার্বত্য এলাকার একটি স্থান দিয়ে টুরিস্ট পাশ সংগ্রহ করে ২৪ ঘণ্টার জন্য মিউনিখে গোপনে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যান।

তিনি মিউনিখে যাওয়ার পথে ট্রেনে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। মিউনিখে রাস্তায় দুই-চারদিন আগে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন অবলোকন করেন। সেখানেও সতর্কতার সঙ্গে কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি সেখানে সর্বত্র নাৎসি গোয়েন্দা বাহিনীর প্রচুর সদস্যের উপস্থিতি অবলোকন করেন। তার কাছে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ফুসিক রাতে মিউনিখের শহরতলিতে একটি খড়ের গাদার মধ্যে রাত কাটিয়ে নিরাপদে প্রাগে ফিরে আসেন। সঙ্গে করে নিয়ে আসেন প্রচুর বাস্তব তথ্য ও অভিজ্ঞতা। অতঃপর তিনি তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিষয়ে রিপোর্ট লিখতে থাকেন।

ওই সময়ে চেকোস্লোভাকিয়ায় নেরুদাকে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিতর্কে জুলিয়াস ফুসিক অংশগ্রহণ করেন এবং তার নিজস্ব অভিমত জোরালোভাবে প্রকাশ করেন। বিতর্কটা শুরু হয়েছিল এভাবে–দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে একজন সাংবাদিকের কার্যাবলি ও জীবন নিঃশেষ হয়ে যায় কিনা! ফুসিক তার লেখায় এবং চিন্তা-জীবন দর্শন থেকে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, একজন সাংবাদিকের কর্মকাণ্ড ও জীবন কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না।

চেকোস্লোভাকিয়ায় নেরুদা একজন প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কাব্যচর্চাও করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় চেকোস্লোভাকিয়ার সাহিত্য সমালোচকরা জান নেরুদার সাংবাদিকতাকে তার কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা নেরুদার সাংবাদিকতাকে নিরুৎসাহিত করতে থাকেন। এ ব্যাপারে তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করেন ফুসিক। তিনি নেরুদার সাংবাদিকতার পক্ষে জোর অভিমত ব্যক্ত করেন। কবিতা রচনার পক্ষের সাহিত্যামোদীদের যুক্তি হলো, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলি নিয়ে সাংবাদিকের লেখনীকে ব্যবহার করার ফলে কবির চিরন্তনী মূল্যবোধকে বিঘ্নিত করে। কবির প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। ফুসিক সাংবাদিকতা পেশার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, 'যদি সেই সাংবাদিক সত্যিকার অর্থে প্রগতিশীল সাংবাদিকতা করেন, সেটাই হচ্ছে চিরন্তন মঙ্গলের স্থায়ী পথ।'

জুলিয়াস ফুসিক লিখলেন, 'কেউ কেউ নেরুদার সাংবাদিকতা নিয়ে সংবাদ রচনা নেরুদার কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে বলে বলছেন। কথাটি অর্বাচীনতা ছাড়া কিছু নয়! নেরুদা যেহেতু সাংবাদিক, সেজন্য তার পক্ষে মহৎ ব্যালাড, রোমান্টিক কবিতা, ফ্রাইডে সং এবং সহজ কথা ও বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা সম্ভব হয়েছে। সাংবাদিকতা কোনো মানুষের ক্ষমতাকে খর্ব করে না, অথবা তার প্রতিভাকে সীমিত করে না। পক্ষান্তরে তাকে তার পাঠকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। নেরুদার মতো ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিককে কাব্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। সংবাদপত্রজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেরুদা হয়তো বহু ভলিউম কবিতা রচনা করতে পারতেন; কিন্তু সেগুলোর স্থায়িত্ব শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করত কি না সন্দেহ।'

ফুসিক যেহেতু প্রগতিশীল সাংবাদিকতায় বিশ্বাস করতেন, সেহেতু তিনি আন্তর্জাতিক সংহতিসম্পন্ন সাংবাদিক সংগঠন গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সব সময়ের জন্য এমনকি বর্তমানকালের গণতন্ত্রমনা সাংবাদিকদের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলতে প্রাণপাত করেছেন।

প্রধানত ফুসিকের আবেদন ছিল সর্বব্যাপী সংহতি ও সহযোগিতা গড়ে তোলা। তিনি এই কাজে হাত দিয়েছিলেন একটি কঠিনতম সময়ে, যখন চেকোস্লোভাকিয়া ফ্যাসিবাদী নাৎসি জার্মানি দখল করে নিয়েছে।

হিটলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর জার্মানির সম্প্রসারণবাদী নীতির অনুসরণে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করেন এবং জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করেন। হিটলারের ক্ষমতালিপ্সা এবং সমগ্র ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার উন্মত্ত বাসনায় এরপর ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্সসহ অন্যান্য ছোটো দেশ দখলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হিটলারের হিংস্রতা, ধূর্ততা, মিথ্যার বেসাতি এবং দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী ইংল্যান্ড ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো দখল করে নেয়। হিটলারের উদগ্র বাসনার যূপকাষ্ঠে ইউরোপে লাখ লাখ নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতা নিহত হয়। ৬০ লাখ ইহুদিকে হিটলার হত্যা করেন গ্যাস চেম্বার ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

জুলিয়াস ফুসিকের সর্বাত্মক আবেদন ছিল একটি সুবৃহৎ ও সম্মিলিত শক্তির সংহতি ও সহযোগিতা গড়ে তোলা। চেকোস্লোভাকিয়া যখন জার্মানি দখল করে নিয়েছে, তখন তার ওই বিষয়ে প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ ঘোষিত দৈনিক 'রুড প্রাভো' পত্রিকায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যুদ্ধে ভয়াবহতা অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চরম অবস্থায়। হিটলারের রণোন্মত্ত নাৎসি বাহিনী সমগ্র ইউরোপকে করে তুলেছে ধ্বংসের মৃত্যুপুরী।

জুলিয়াস ফুসিক বারবার ফিরে এসেছেন তার স্বপ্নলোকের সেই চারণভূমিতে। তার জ্ঞানলোকের ধারণাক্ষেত্রে। তার সেই ধারণাকে তিনি প্রতিমুহূর্তে করতে চেয়েছেন সম্প্রসারণ। ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সারা বিশ্বে। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জনগণ ও শক্তির একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গড়ে তোলাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এই জোট বর্তমান এবং আগামী দিনের শান্তিকে করে তুলবে নিরঙ্কুশ। ধ্বংস করবে যুদ্ধবাজ ফ্যাসিবাদী শক্তিকে।

ফুসিকের সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, চিন্তাভাবনা, ধারণা, তার মূল কথাটা 'রিপোর্ট ফ্রম দ্য গ্যালোজ'-এর শেষ বাক্যটির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সেই কথাটি হচ্ছে–'জনগণ আপনাদের আমি ভালোবেসেছি। আপনারা সতর্ক থাকুন!' ফুসিকের জীবনের মহত্তম রচনার মূলমন্ত্রই হচ্ছে জনগণ। তার এই রচনার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। কারণ তিনি জানেন, বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। নাৎসি কারাগারে তাকে যে কোনো সময় ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

জুলিয়াস ফুসিক এক মহত্তম সাংবাদিক, এক মহত্তম মানবপ্রেমিক। শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত মেহনতি মানুষের জন্য তার অপার ভালোবাসা ও দরদের মধ্যে কোনো খাদ নেই। এরকম জনদরদি সাংবাদিক বিশ্বে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। একটি বিশেষ ইজমে বিশ্বাস করতেন। সেই সময়ে রুশ বিপ্লবের প্রতি সারা বিশ্বের তরুণরা মনে করতেন–মার্কসবাদ বিশ্বের দুর্গত, নির্যাতিত ও মেহনতি মানুষের জন্য মুক্তি নিয়ে আসবে।

অবশ্য বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ সেই বিশেষ আদর্শ ও মতবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। সেই ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিট রিপাবলিক অর্থাৎ ইউএসএসআর-এর পতন ঘটেছে। স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির পতন ঘটাতে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে একটি পরাশক্তিতে পরিণত হয়।

একই সঙ্গে স্টালিনের স্বৈরশাসন সোভিয়েত ইউনিয়নে তার মৃত্যুর পর তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। গণতান্ত্রিক বিশ্বে অনেকে স্টালিনকে হিটলারের সঙ্গেও তুলনা করতে দ্বিধা করেননি। যাক, এটা অন্য প্রসঙ্গ।

জুলিয়াস ফুসিকের আদর্শ, মতবাদ, বিশ্বাস বিশ্বের নির্যাতিত মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য তার আকাঙ্ক্ষা ছিল অসীম। তিনি ছিলেন অকুতোভয়, আদর্শবাদী এক গণদরদি সাংবাদিক।

জুলিয়াস ফুসিক সম্পর্কে আরও কিছু জরুরি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। না হলে তার জীবনদর্শন ও চরিত্রের মহৎ দিকগুলো আবরণের অন্তরালে থেকে যাবে। তিনি যখন 'রিপোর্ট ফ্রম দ্য গালোজ' লেখেন, তখন তার ফাঁসির রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তার মাস্টারপিস কোনো কম্পিত হাতে লেখা নয়। তার এই জীবনদর্শন রচনার সময় মানসিকভাবে তিনি জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করছিলেন। ওইরূপ মানসিক অবস্থায় তিনি জনগণ এবং সাংবাদিকসমাজের জন্য একটি মহত্তম মূল্যবান জীবনদর্শন রেখে যেতে চেয়েছিলেন। অবধারিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তার হাত কাঁপেনি। কারণ, একজন প্রকৃত ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের শির থাকে চির উন্নত এবং কর্তব্য পালনে অকুতোভয়। তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জনগণের জন্য, দেশের জন্য প্রকৃত তথ্য, সত্য ঘটনা প্রকাশ করে যান। একজন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে আপসহীনতা এবং তার বিবেক। একটি কঠিন সময়ের এবং প্রতিকূল পরিবেশে লিখিত একজন সাংবাদিকের রিপোর্ট হয়ে ওঠে আত্মজীবনীমূলক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে হিটলারের কারাগারে ফুসিকের লিখিত ওই রিপোর্টও ফুসিকের আত্মজীবনী ও জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি।

কারাগারে স্বীকারোক্তি আদায়ে জার্মান গোয়েন্দাদের নির্মম ও বর্বর নির্যাতন, ফাঁসির রজ্জুর মুখোমুখি অবস্থায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপির মধ্যে কোন ক্রন্দসী হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি নেই। তাই তিনি লিখেছেন, 'আমি আনন্দের জন্য জীবনধারণ করেছি, আনন্দলাভের জন্য যুদ্ধে গিয়েছি, আমি আনন্দের জন্যই মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছি, আমার নামের সঙ্গে যেন দুঃখকে জড়িত করা না হয়।'

চেকোস্লোভাকিয়া দখলের পর হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফুসিককে জার্মানিতে নিয়ে আসে। প্রথমে তাকে বাউটজেনের একটি কারাগারে দুই মাসের ওপর আটক রাখা হয়। পরে তাকে বার্লিনে আনা হয়। ১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট বার্লিনের একটি আদালতে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিচার করা হয়। ওই আদালতের যিনি বিচারক ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন কট্টর এবং

কুখ্যাত নাৎসি মতবাদের গোঁড়া সমর্থক রোলান্ড ফ্রিয়েশলার। ফুসিককে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে তার অপর একজন সহযোগী জারোশ্লাভ ক্লেকান-এর সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জুলিয়াস ফুসিককে বার্লিনের প্লোটজেনসি কারাগারে ১৯৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ফুসিকের স্ত্রী গুসতা ফুসিকোভা 'ফুসিক'-এর রচনাবলি নিয়ে গবেষণা করেন এবং তার সব রচনাবলি উদ্ধার ও সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। গুসতা ফুসিকোভা চেক কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় সম্পাদনা ও পুস্তকাকারে তার রচনাবলি প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালে রিপোর্ট ফ্রম দ্য গ্যালোজ পুস্তকাকারে ছাপা হওয়ার পর ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার স্টালিনপন্থিরা ক্ষমতা দখলের পর গ্রন্থটি ৯০টি ভাষায় অনূদিত হয়।

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট সরকার ফুসিকের রচনাবলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে। ফুসিক কমিউনিস্ট শাসিত চেকোস্লোভাকিয়ায় একজন হিরোর মর্যাদা লাভ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে জুলিয়াস ফুসিকের ছবি টাঙানো হতে থাকে। তার স্ত্রী গুসতা ফুসিকোভাকে চেক কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা শাখার চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করা হয়। সুদীর্ঘকাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জুলিয়াস ফুসিকের নামানুসারে চেকোস্লোভাকিয়ার বহু স্থান, প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনীর ইউনিট, রাস্তাঘাটের নামকরণ করা হয়। একটি সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজের নামকরণও তার নামে করা হয়।

জুলিয়াস ফুসিক ১৯০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রাগের একটি শ্রমজীবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একটি ইস্পাত কারখানায় কাজ করতেন। তার এক চাচা কবি ছিলেন এবং তার নামও ছিল জুলিয়াস ফুসিক। ১৯১৩ সালে ফুসিক তার পরিবারের সঙ্গে প্রাগ থেকে পিলজেনে গমন করেন। সেখানে তিনি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১২ বছর বয়সেই ফুসিক একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করতে থাকেন। তিনি ওই পত্রিকার নামকরণ করেন 'স্লোভান'। তিনি অল্প বয়স থেকেই রাজনীতি এবং সাহিত্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তরুণ ফুসিক স্থানীয় শৌখিন থিয়েটারে প্রায়ই অভিনয় করতেন।

১৯২০ সালে ফুসিক প্রাগে পড়াশোনা শুরু করেন। ওই সময় তিনি চেকোস্লোভাক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগ দেন। ওই দলে কাজ করতে করতে ফুসিক বামপন্থি রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়েন। ১৯২১ সালে উপরিউক্ত রাজনৈতিক দলের বামপন্থি গ্রুপ কমিউনিস্ট পার্টি অব চেকোস্লোভাকিয়া (সিপিসি) গঠন করে। ফুসিক ওই সময় প্রথম পিলজেন নামক সিপিসির পত্রিকায় সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

পড়াশোনা শেষ করে ফুসিক 'কোমন' নামক সাংস্কৃতিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব তার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। ১৯২৯ সালে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফ্রান্টিসেক জেভার সালদার ম্যাগাজিন 'ভোরবা'য় ফুসিক যোগদান করেন। এছাড়া ফুসিক সিপিসির সংবাদপত্র 'রুড প্রাভো'তে নিয়মিত কাজ করেছেন। এর বাইরেও তিনি অন্যান্য সংবাদপত্রে কাজ করতেন। এই সময় চেকোস্লোভাকিয়ার গোয়েন্দা পুলিশ তাকে কয়েকবার গ্রেফতার করে। ১৯৩৪ সালে তাকে আট মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তবে তিনি কৌশলে পালিয়ে যান।

১৯৩০ সালে জুলিয়াস ফুসিক চার মাসের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মধ্য এশিয়া সফর করেন। তার সফরের ওপর ১৯৩২ সালে একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ রচনা করেন। সমাজতন্ত্র ওই অঞ্চলে জনগণের জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে, তিনি তার ওই গ্রন্থে তা চিত্রিত করেন। গ্রন্থটির নাম 'ইন এ ল্যান্ড হোয়্যার টুমরো ইজ অলরেডি ইস্টারডে'। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পরপরই তিনি ব্যাভেরিয়া সফর করেন। তার ওই সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন 'রোড টু মিউনিখ'।

লেখক: প্রয়াত সম্পাদক, দৈনিক জনতা

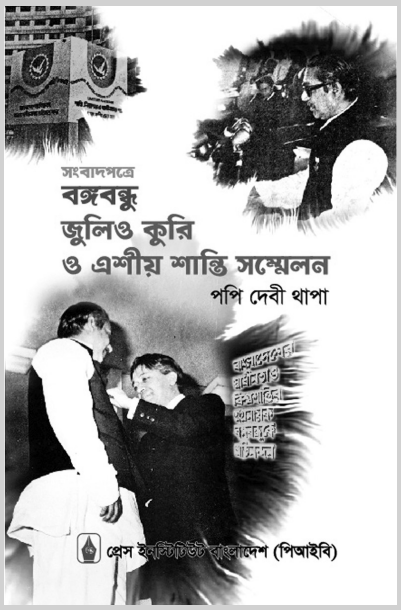

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সংবাদপত্রে
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান
ড. কামরুল হক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ৩ মে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও গণতন্ত্র সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, ছবি: সমকাল

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা উন্নয়নশীল দেশে উদাহরণ: তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিস্তৃতি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। আমরা মুক্ত গণমাধ্যমে বিশ্বাস করি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। প্রতিবেশী অনেক দেশেই গণমাধ্যমের এ রকম বিস্তৃতি ঘটেনি এবং এমন অবাধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কাজ করে না। একই সঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতাকে যোগ করতে হয়, তাহলেই গণমাধ্যম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। আর যদি স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতা না থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষতি হয়, রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয়। ৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের উদ্যোগে নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত 'মানবাধিকার সংরক্ষণ ও গণতন্ত্র সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বেগম ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, দৈনিক সমকাল সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেসক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক মো. আইয়ুব ভুঁইয়া তাদের আলোচনায় দেশে গণমাধ্যমের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পথযাত্রা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, 'যখন সংবাদমাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ হয়, সেই পুঁজির দৌরাত্ম্য সাংবাদিকদের ওপর খড়্গ বসায়, তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের পক্ষ থেকে কী প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সেটি নিয়ে আমরা সবসময় আলোচনা করি কিন্তু আমি মনে করি সুস্থভাবে, অবাধে, ভয়হীন পরিবেশে কাজ করার ক্ষেত্রে মালিক পক্ষের পুঁজির দৌরাত্ম্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, অবশ্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। (সূত্র: ০৪ মে ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের নিবন্ধ

মুক্ত গণমাধ্যম গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান

মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যম গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মাধ্যমে নাগরিকরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথ্য জানতে পারেন। পাশাপাশি তাদের নেতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও পান। স্বাধীন গণমাধ্যমের অধিকারের বিষয়টি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দলিলের পাশাপাশি বাংলাদেশসহ অনেক দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে ৩ মে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সমন্বয়ে গড়ে তোলা মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের (এমএফসি) যৌথ নিবন্ধে এসব কথা বলা হয়েছে।

নিবন্ধে বলা হয়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষার মূল্যবোধকে সম্মিলিতভাবে সমুন্নত রাখি। সাংবাদিকদের অবশ্যই হয়রানি, ভীতি বা সহিংসতার ভয় ছাড়াই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

গবেষণার বরাতে নিবন্ধে বলা হয়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বেশি এমন দেশগুলোয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বেশি। এর সহজ কারণটি হলো, মুক্ত গণমাধ্যম স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জবাবদিহি নিশ্চিত করে; যা দুর্নীতি কমায় এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে ত্বরান্বিত করে। এটা ব্যাবসাবান্ধব পরিবেশের জন্য সহায়ক।

যৌথ নিবন্ধটি তৈরি করেছে ঢাকায় অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র মিশন।

৩ মে দিবসটি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। আমেরিকান সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকার বিভিন্ন দেশের মিশনপ্রধানসহ এমএফসির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। (সূত্র: ৪ মে ২০২৩, সমকাল)

নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

দেশে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়াতে হবে

সব ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে থাকলেও দেশে সাংবাদিকতা পেশায় নারীর সংখ্যা খুবই কম। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হলে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। ২১ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন মিলনায়তনে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি নাসিমুন আরা হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, ইউএনবির সম্পাদক ফরিদ হোসেন ও বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক। বক্তব্য দেন নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ঝুমা পারভীন, যুগ্মসম্পাদক অদিতি রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্যপ্রয়াত সাংবাদিক সেতারা মূসার রুহের মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সংগীত পরিবেশন করেন শামা রহমান। এ সময় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। (সূত্র: ২২ মার্চ ২০২৩, সমকাল)

ডিআরইউর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ঐক্যেই সমৃদ্ধি স্লোগানকে ধারণ করে উদ্‌যাপিত হয়েছে ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২৬ মে ডিআরইউ চত্বরে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

ডিআরইউ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য আয়োজনের উদ্‌বোধন করা হয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী।

উদ্‌বোধন শেষে ডিআরইউ প্রাঙ্গণ থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির নেতারাসহ সংগঠনের সদস্য ও সাবেক নেতাদের নিয়ে বের করা শোভাযাত্রা রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। বিকালে ডিআরইউতে কেক কাটা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সম্মাননা দেওয়া হয়।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উপনেতা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানীর সভাপতিত্বে সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল আহসান এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামাল উদ্দিন সুমন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরে স্মৃতিচারণামূলক বক্তব্য দেন ডিআরইউর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন খাদেম ও রফিকুল ইসলাম আজাদ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, আযম মীর শহীদুল আহসান, কাজী আবদুল হান্নান, সৈয়দ আখতার ইউসুফ, অজিত কুমার সরকার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বিএফইউজের একাংশের মহাসচিব নুরুল আমিন রোকন, ডিইউজের দুই অংশের সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে শহিদুল ইসলাম ও আকতার হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজের একাংশের সভাপতি এম আবদুল্লাহ, ডিআরইউর সাবেক সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশা ও ইলিয়াস হোসেন। (সূত্র: ২৭ মে ২০২৩, কালের কণ্ঠ)

বৈশ্বিক গণমাধ্যম পুরস্কারে প্রথম আলোর দুই স্বীকৃতি

গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩-এ দুটি পুরস্কার পেয়েছে প্রথম আলো। ২৬ মে নিউইয়র্কের হার্ভার্ড ক্লাব মিলনায়তনে গণমাধ্যমের বিশ্ব কংগ্রেসের সমাপনী সন্ধ্যায় এই পুরস্কার ঘোষণা এবং বিতরণ করা হয়।

বিজ্ঞাপন বৃদ্ধিতে সেরা আইডিয়া বিভাগে জাতীয় ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে প্রথম আলো তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে। প্রথম আলোর উদ্যোগের নাম ছিল বিকাশ ইদ আয়োজন! আর প্রথম আলো ই-পেপার লাভ করে বেস্ট প্রোডাক্ট আইটেরেশন বিভাগে সম্মানসূচক স্বীকৃতি। পৃথিবীর ৪০টি দেশের ২৩৯টি সংবাদপত্র,

২৬ মে নিউইয়র্কের হার্ভার্ড ক্লাব মিলনায়তনে প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হকের হাতে গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসের সম্মাননা সনদ তুলে দেন ইনমার প্রেসিডেন্ট ম্যারিবেল পেরেজ ওয়াডসওয়ার্থ

ম্যাগাজিন, ডিজিটাল মিডিয়া, টেলিভিশন ও রেডিয়ো থেকে ৭৭৫টি প্রকল্প পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ইনমার প্রেসিডেন্ট ম্যারিবেল পেরেজ ওয়াডসওয়ার্থ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লেখক ও উপস্থাপক টেরি কারেল। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক।

ইনমা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩-এ দক্ষিণ এশিয়ার সেরা পুরস্কার লাভ করে টাইমস অব ইন্ডিয়া। পূজার গান নিয়ে বিশেষ আয়োজনের জন্য একটি বিভাগে প্রথম পুরস্কার পায় আনন্দবাজার গ্রুপ। আঞ্চলিক পত্রিকা ক্যাটাগরিতে দুটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে ভারতের জাগরণ। সারা পৃথিবীর গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা এই বিশ্ব মিডিয়া কংগ্রেসে যোগ দেন।

গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩-এর সেরা পুরস্কার 'বেস্ট ইন শো' পেয়েছে নরওয়ের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম শিফস্টিডের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বার্গেনস টিডেন। এই আয়োজনের সহযোগী ছিল গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভ।

এবার মোট ২০টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোর উদ্ভাবনী ও বেস্ট প্র্যাকটিস, মিডিয়া প্ল্যাটফরমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার, সাবস্ক্রিপশন, ব্যবসায় উন্নয়ন এবং ডেটা ও ইনসাইটস বিবেচনায় সেরা উদ্যোগগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ইনমার আফ্রিকা, এশিয়া-প্যাসিফিক, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ এশিয়া–এই ছয় অঞ্চলের নির্বাচিত আঞ্চলিক সেরা উদ্যোগগুলোকে গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিবেচনা করা হয়। মার্চে ইনমা প্রাথমিক মনোনীতদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করে, যেখানে প্রথম আলোর এ দুটি প্রকল্প স্থান পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসভিত্তিক বৈশ্বিক সংগঠন ইনমা ১৯৩৭ সাল থেকে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিয়ে আসছে। ৭৭টি দেশের আট শতাধিক সংবাদমাধ্যম ইনমার সদস্য। সংবাদমাধ্যমের ব্যাবসা, ব্র্যান্ড ও পাঠকদের নিয়ে কাজ করা বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠন এটি।

ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে প্রথম আলোর তৃতীয় পুরস্কার: 'বেস্ট আইডিয়া টু গ্রো অ্যাডভারটাইজিং সেলস' ক্যাটাগরিতে তৃতীয় স্থান পেল প্রথম আলো ডিজিটালের 'বিকাশ ইদ আয়োজন' ক্যাম্পেইনটি। পবিত্র ঈদুলফিতরে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের সঙ্গে যৌথভাবে এ আয়োজন করে প্রথম আলো। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে 'কনটেন্ট টু কমার্স' নামে নতুন একটি ধারা তৈরি করা হয়। ওই সময় প্রথম আলো অনলাইনে ফ্যাশন, খাবার ও জীবনধারা নিয়ে প্রকাশিত লেখাগুলো থেকে কিছু নির্ধারিত শব্দ বাছাই করে সেগুলো থেকে পাঠকদের প্রাসঙ্গিক পণ্য কেনার ওয়েবসাইট ও দোকানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই ক্যাটাগরিতে প্রথম হয় নরওয়ের এমেডিয়া। দ্বিতীয় পুরস্কার পায় দক্ষিণ আফ্রিকার মিডিয়া টোয়েন্টিফোর।

১ ফেব্রুয়ারি ভারতের নয়াদিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের আরেক শীর্ষ সংগঠন ওয়ান-ইফরা আয়োজিত সাউথ এশিয়ান ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২২-এ সোনা পায় এ প্রকল্প।

বিজ্ঞাপন বৃদ্ধিতে সেরা আইডিয়া বিভাগে জাতীয় ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে প্রথম আলো তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে। প্রথম আলোর উদ্যোগটির নাম ছিল বিকাশ ইদ আয়োজন।

প্রথম আলো ই-পেপারের সম্মানজনক স্বীকৃতি: প্রথম আলো ছাপা পত্রিকার মতো হুবহু খবর পড়া যায় eprothomalo.com-এ। এটি বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন সংবাদসেবা, যেখানে টাকা দিয়ে নিবন্ধন করে সংবাদ পড়তে হয়। 'বেস্ট প্রোডাক্ট আইটেরেশন' ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক স্বীকৃতি পায় প্রথম আলো ই-পেপারের উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

এই ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পায় ডেনমার্কের পলিটিকেন হাস, দ্বিতীয় পুরস্কার পায় জার্মানির সাডেচ ডাইচিং ডিজিটাল মিডিয়া। তৃতীয় পুরস্কার পায় নরওয়ের আফটেন পোস্টেন। ১ ফেব্রুয়ারি ওয়ান-ইফরা আয়োজিত সাউথ এশিয়ান ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২২-এ দুটি ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ পায় প্রকল্পটি।

এ নিয়ে টানা তিনবার ইনমার গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার পেল প্রথম আলো। গত বছর একটি প্রথম, একটি দ্বিতীয় ও একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি পায় প্রথম আলো। এর আগে ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি মিলেছিল। (সূত্র: ২৮ মে ২০২৩, প্রথম আলো)

পুষ্টি সুশাসন বিষয়ে ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১০ সাংবাদিক

পুষ্টি সুশাসন নিশ্চিতে প্রতিবেদনের জন্য ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১০ সাংবাদিক। ১৮ এপ্রিল রাজধানীর ডেইলি স্টার সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেওয়া হয়।

'কালেক্টিভ রেসপনসিবিলিটি, অ্যাকশন অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিবিলিটি ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন' প্রকল্পের এ অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও উন্নয়নকর্মীরা অংশ নেন। এতে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) কৌশলগত সহযোগিতা দেয়। বাস্তবায়নে ছিল গণমাধ্যমবিষয়ক বেসরকারি সংগঠন সমষ্টি।

ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন সমকালের জাহিদুর রহমান, চ্যানেল২৪-এর জিনিয়া কবীর সূচনা, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জয়শ্রী ভাদুড়ী, একাত্তর টিভির ডলার মেহেদী, সময় টিভির রাশেদ বাপ্পী, চ্যানেল আইয়ের জহীর মুন্না, বিজনেস পোস্টের রোকন উদ্দীন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের কামরুন্নাহার শোভা, যমুনা টিভির ইয়ামীন আলী এবং আজকের পত্রিকার এসএস সোহান।

কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মনীষ কুমার আগারওয়ালের সভাপতিত্বে ও সমষ্টির পরিচালক মীর মাসরুর জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সমকালের সহযোগী সম্পাদক সবুজ ইউনুস, ঢাকা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াজ আহমদ, চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ খান, মানবজমিনের বার্তা সম্পাদক কাজল ঘোষ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুড কার্যক্রমের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মেহের নিগার ভুইঞা এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের ইমরানুল হক। অনুষ্ঠানে পুষ্টি সুশাসনে সাংবাদিকতা নিয়ে প্রশিক্ষণ মডিউলের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। (সূত্র: ১৯ এপ্রিল ২০২৩, সমকাল)

বাংলাদেশ প্রেস ফটো কনটেস্ট-২০২৩

প্রেস ফটোগ্রাফারদের ছবি নিয়ে দৃক পিকচার লাইব্রেরি দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করেছে বাংলাদেশ প্রেস ফটো কনটেস্ট-২০২৩। গত বছরের বাছাইকৃত ছবিগুলোর মধ্য থেকে একটি ছবিকে পিকচার অব দি ইয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এক বছরে আলোকচিত্র সাংবাদিকতা এবং তথ্যমূলক আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কাজগুলো নির্ধারণের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাতজনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত করা হয়েছে।

পেশাদার আলোকচিত্রী ও ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী দ্বারা ১ হাজার ৫০০-এর বেশি আলোকচিত্রীর মধ্য থেকে সাত আলোকচিত্রীর শ্রেষ্ঠ কাজগুলোকে বিজয়ী হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আলোকচিত্রী, সম্পাদক ও শিক্ষক আবির আবদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামান, ভারতীয় সম্পাদক, কিউরেটর ও লেখক তানভি মিশরা এবং আলোকচিত্রী, অ্যাক্টিভিস্ট ও কিউরেটর শহিদুল আলম।

২০২২ সালে ঢাকার চকবাজারের একটি পলিথিন কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ছয়জন। এই ট্র্যাজেডির একজন প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর ব্যালকনি থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। এই ছবিটির জন্যই খেতাব জিতে নিয়েছেন আলোকচিত্রী আব্দুল গনি। ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রেস ফটো কনটেস্ট ২০২২-এ প্রথম স্থান অধিকারী আব্দুল গনি পাবেন ১ লাখ টাকা। সঙ্গে রয়েছে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও বার্ষিক বইয়ের সংস্করণ।

এছাড়া কলা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া খাতে পুরস্কার জিতেছেন ডেইলি গ্লোবাল নেশনের মো. শামসুল হক সুজা ও ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশের আবু সুফিয়ান জুয়েল। রাজনীতি বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন দৈনিক কাজীর বাজারের মামুন হোসেন এবং ফোকাস বাংলার আলোকচিত্রী কুদ্দুস আলম। জনস্বার্থ সাংবাদিকতায় পেয়েছেন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সরদার মোহাম্মদ রফিউল ইসলাম ও জুমা প্রেসের আলোকচিত্রী মো. রাফায়াত হক খান। (সূত্র: ৭ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

পিয়ারি বেগমের স্বপ্ন ছিল মধুবালার মতো অভিনয় করা

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা জীবনে পিয়ারী বেগম-আমিনুল হক দম্পতির সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় ছিল। পিয়ারী বেগমের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করি 'মুখ ও মুখোশ' ছবির পরিচালক আব্দুল জব্বার খানের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে। যত দূর মনে পড়ে, ওই সময় উনি কমলাপুরে জসীমউদ্‌দীন রোডে থাকতেন। ওনার স্বামী আমিনুল হক বিমানে চাকরি করতেন, চাকরির পাশাপাশি অভিনয় করতেন।

দুজনের সঙ্গেই আমার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওনারা আসতেন। দুই বছর আগে ফিল্ম আর্কাইভের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে পিয়ারী বেগমের সঙ্গে সর্বশেষ দেখা হয়েছিল। খুবই বিনয়ী ও অতিথিপরায়ণ মানুষ ছিলেন।

আমরা বাসায় গেলে খুবই আপ্যায়ন করতেন। ওনার জন্ম ও বেড়ে ওঠা পুরান ঢাকায়। পরিবার অভিনয়ে দিতে চায়নি। সেই গল্প ওনার মুখেই শুনেছি।

আব্দুল জব্বার খান গিয়ে বলেছেন, 'আমার একটা মেয়ে আছে। আমার আরেকটি মেয়ে বানিয়ে ওকে নিচ্ছি।'

পিয়ারী বেগম ছোটোবেলা থেকেই খুব সিনেমা দেখতেন। তাজমহল হলে নাকি উনি প্রচুর সিনেমা দেখেছেন।

ওনার মনে স্বপ্ন ছিল মধুবালার মতো অভিনয় করবেন। রেডিয়োতেও কণ্ঠ দিয়েছিলেন। সেখানেই আমিনুল হক সাহেবের সঙ্গে পরিচয়, প্রেম ও বিয়ে। স্বামীর ইচ্ছায় উনি আর চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, এই যে অভিনয় করতে পারছেন না, আপনার কি ক্ষোভ আছে? বলেছিলেন, 'না। আমি সুন্দর করে পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখতে পারছি, এটাও কম প্রাপ্তির নয়।'

অনুপম হায়াৎ: চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখক, গবেষক ও শিক্ষক

(সূত্র: ৩১ মে ২০২৩, কালের কণ্ঠ)

সাউথ বাংলা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

আবু সাঈদ খান আহ্বায়ক মিঠু সদস্যসচিব

ঢাকায় কর্মরত দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে সাউথ বাংলা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

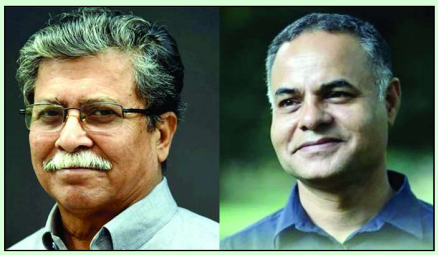

হয়েছে। ১৬ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান কমিটির আহ্বায়ক এবং জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মিঠু সদস্যসচিব নির্বাচিত হয়েছেন।

৩০ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির অন্যরা হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক পিআর বিশ্বাস ও মুহাম্মদ আলম হোসেন খান, যুগ্ম সদস্য সচিব শেখ মুহাম্মদ জামাল হোসাইন। কমিটির সদস্যরা হলেন–দীপ আজাদ, রাকিব হাসনাত সুমন, মোহসিন হাবিব, বোরহানুল হক সম্রাট, সিদ্দিকুর রহমান, এমএ কুদ্দুস, মোজাম্মেল হক চঞ্চল, আহমেদ পিপুল, শরীফ উদ্দিন লিমন, বাণী ইয়াসমিন হাসি, মামুন ফরাজী, ওয়াকিল আহমেদ হিরন, আশীষ কুমার দে, মুজিবুর রহমান জিতু, পান্থ রহমান, সিদ্দিকুর রহমান খান, রেজাউল করিম, হেমায়েত হোসাইন, কাজী সোহাগ, দেব দুলাল মিত্র, রাজু হামিদ, শাহিদুল হাসান খোকন, পলাশ মাহমুদ, এসকে রেজা পারভেজ ও নাদিয়া শারমিন। (সূত্র: ১৭ এপ্রিল ২০২৩, সমকাল)

মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি যাকারিয়া সম্পাদক আলতাফ

বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত মোবাইল জার্নালিস্ট (মোজো) ও মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টারদের সংগঠন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সমকালের যাকারিয়া ইবনে ইউসুফ এবং সম্পাদক হয়েছেন মানবজমিনের আলতাফ হোসাইন। ২২ মার্চ রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে সংগঠনের

অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগামী এক বছরের জন্য ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএফইউজে মহাসচিব দীপ আজাদ, ডিআরইউ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল, বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টাররা।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি তাওহীদ মামুন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক রুকাইয়া জহির, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মামুন সোহাগ, অর্থ সম্পাদক রহমত উল্লাহ, প্রচার সম্পাদক ইসমাঈল সিরাজী, নারীবিষয়ক সম্পাদক অরিন সুলতানা, প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক আল ইমরান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক সিকদার মোহাম্মদ সাব্বির, সাহিত্য সম্পাদক রাব্বি হোসাইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আকতারুজ্জামান, ক্রীড়া সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম, আপ্যায়ন সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য আকরাম হোসেন নাঈম, আবদুল্লাহ মামুন, তানভীর আহমেদ এবং মিফতাহুল জান্নাত। (সূত্র: ২৩ মার্চ ২০২৩, সমকাল)

ল রিপোর্টার্স ফোরাম

সভাপতি শামীমা সম্পাদক হাবিব

আইন, বিচার ও মানবাধিকারবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) সভাপতি পদে দেশ টিভির শামীমা আক্তার ও নয়া দিগন্তের হাবিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ২৩ জুন সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির দক্ষিণ হলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরে নির্বাচিত ১৩ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আশরাফ-উল আলম। এ সময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মিজান মালিক ও তোফায়েল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

অন্য পদে নির্বাচিতরা হলেন সহসভাপতি প্রথম আলোর প্রশান্ত কুমার কর্মকার, যুগ্মসম্পাদক বাংলাদেশ প্রতিদিনের আরাফাত মুন্না, অর্থ সম্পাদক চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মনজুর হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক ঢাকা পোস্টের মেহেদী হাসান ডালিম, দপ্তর সম্পাদক সময়ের আলোর মাহমুদুল আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বাংলা ট্রিবিউনের বাহাউদ্দিন আল ইমরান, প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ সম্পাদক পদে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের জান্নাতুল ফেরদৌস তানভী। এছাড়া সদস্য পদে দৈনিক মুখপাত্রের শেখ মুহাম্মদ জামাল হোসাইন, চ্যানেল২৪ এর আবু নাসের, দি রিপোর্টের এসএম শাকিল আহমেদ ও সময় টেলিভিশনের মার্জিয়া হাশমী মুমু। এর আগে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ি সভাপতি আশুতোষ সরকারের সভাপতিত্বে এবং বিদায়ি সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ সারোয়ার হোসেন ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় সাধারণ সদস্যরা বক্তব্য দেন। (সূত্র: ২৪ জুন ২০২৩, সমকাল)

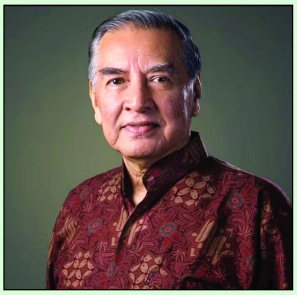

মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের চেয়ারপারসন মাহ্‌ফুজ আনাম

মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহ্‌ফুজ আনাম। ১৮ এপ্রিল মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের পরিচালনা পর্ষদের সভায় তাঁকে চেয়ারপারসন নির্বাচিত করা হয়। মিডিয়া ওয়ার্ল্ড থেকে ডেইলি স্টার প্রকাশিত হয়।

মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের চেয়ারপারসন রোকিয়া আফজাল রহমান ৫ এপ্রিল মারা যান। মৃত্যুর আগপর্যন্ত ২১ বছর এ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

মাহ্‌ফুজ আনাম (৭৪) দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে ৩০ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে যাত্রা শুরু করা এই পত্রিকার সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি নির্বাহী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক এসএম আলী।

মাহ্‌ফুজ আনাম বর্তমানে বিলুপ্ত বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় ১৯৭২ সালের মার্চে সাংবাদিকতা শুরু করেন। এরপর ১৯৭৪ সালে তিনি দ্য বাংলাদেশ টাইমস-এর সহকারী সম্পাদক হন। (সূত্র: ১৯ এপ্রিল ২০২৩, প্রথম আলো)

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির নেতৃত্বে সাদী-মাহি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসাবে জাগো নিউজ২৪.কম-এর আল-সাদী ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০ জুন টিএসসিতে ঢাবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বোরহানুল হক সম্রাট, নির্বাচন কমিশনার মাহবুব রনি ও সাদ্দাম হোসাইন এ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

সমিতির ৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে সহসভাপতি পদে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের মো. রাসেল সরকার, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ প্রতিদিনের নাসিমুল হুদা, দপ্তর সম্পাদক ভোরের ডাকের জাফর আলী, অর্থ সম্পাদক পদে রেডিয়ো টুডের ইমদাদুল হক আজাদ নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া সংবাদের খালেদ মাহমুদ, আজকের পত্রিকার ছিদ্দিক ফারুক এবং নয়া দিগন্তের হাসান আলী কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্র: ২১ জুন ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

৩২০ বছরের পুরোনো পত্রিকার মুদ্রণ বন্ধ হচ্ছে

৩২০ বছরের পুরোনো সংবদপত্র অস্ট্রিয়ার দ্য উইনার জাইটুং শুধু অনলাইনে প্রকাশ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২৭ এপ্রিল দেশটির পার্লামেন্টে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রমালিকানাধীন পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্ট্রিয়া সরকার ও সংবাদপত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন চলা বিরোধের অবসান হলো। ১৭০৩ সালে প্রকাশিত পত্রিকাটির নামকরণ করা হয় উইনারিসেস ডায়ারিয়ামের নামানুসারে। পরে

১৭৮০ সালে উইনার জাইটুং নামকরণ করা হয়। ১৮৫৭ সালে তৎকালীন সম্রাট ফ্রানজ জোসেফের আমলে পত্রিকাটি রাষ্ট্রমালিকানাধীন হয়। এটিই ছিল অস্ট্রিয়ার প্রথম সরকারি পত্রিকা। শতাব্দীর প্রাচীন এ পত্রিকার ছাপানো বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৫ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার রাস্তায় শত শত মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। (সূত্র: ২৯ এপ্রিল ২০২৩, প্রথম আলো)

যুদ্ধের খবর দিয়ে পুলিৎজার পেল এপি নিউইয়র্ক টাইমস

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বহুমাত্রিক খবর প্রকাশের জন্য এ বছর সাংবাদিকতার নোবেল

পুরস্কারখ্যাত পুলিৎজার পেল বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) ও নিউইয়র্ক টাইমস। ৮ মে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ বছরের পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে। পুলিৎজারে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার ধরা হয় পাবলিক সার্ভিস (জনসেবা) অ্যাওয়ার্ডকে। এ বছর এই পুরস্কার নিজেদের দখলে রেখেছে এপি। এছাড়া ব্রেকিংনিউজ ফটোগ্রাফি বিভাগেও পুরস্কার পেয়েছে এ সংবাদ সংস্থাটি।

পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া এপির সাংবাদিকরা হলেন মিসতিসলাভ চেরনভ, ইভজেনি মালোলেতকা, ভাসিলিসা স্তেপানেঙ্কো ও লরি হিনান্ট। গত বছর ইউক্রেনের মরিওপোল শহরে রাশিয়ার হামলার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে অবস্থান করে এই চার সাংবাদিক বেসামরিক লোকজনের নিহত হওয়ার খবর সংগ্রহ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রতিবেদন বিভাগে সেরার পুরস্কার গেছে নিউইয়র্ক টাইমসের দখলে। এছাড়া ইলাস্ট্রেটেড রিপোর্টিং অ্যান্ড কমেন্টারি বিভাগেও পুরস্কার পেয়েছে তারা। এ নিয়ে পুলিৎজারের ইতিহাসে নিউইয়র্ক টাইমস মোট ১৩৭টি পুরস্কার পেল।

যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাত নিয়ে ধারাবাহিক খবর প্রকাশ করে দেশটির জাতীয় প্রতিবেদনবিষয়ক বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টার ক্যারোলিন কিচেনার। সংবাদমাধ্যমটির হয়ে ফিচার রাইটিং বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন এলি স্যাসলো। স্থানীয় নানা প্রতিবেদন ক্যাটাগরি ও মতামত বিভাগে পুলিৎজার বেদনা ও পুরস্কার পেয়েছে আলাবামা অঙ্গরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এএল ডটকম। এছাড়া ব্রেকিং নিউজ ও ফটোগ্রাফি বিভাগে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস। ফিচার ফটোগ্রাফি বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন ক্রিস্টিনা হাউজ।

এ বছর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য পুলিৎজার জিতেছে সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। এছাড়া কথাসাহিত্য বা ফিকশনের জন্য পুলিৎজার পেয়েছেন বারবারা কিংসলভার এবং হারনান ডিয়াজ।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুলিৎজারকে সাংবাদিকতার নোবেল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯১৭ সাল থেকে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। (সূত্র: ১০ মে ২০২৩, সমকাল)

কান উৎসবের সেরা ছবি 'অ্যানাটমি অব অ্যা ফল'

৭৬তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি স্বর্ণপাম [পাম দ'র] জিতেছে 'অ্যানাটমি অব অ্যা ফল'। এটি পরিচালনা করেছেন ফরাসি নারী নির্মাতা জাস্টিন ত্রিয়েত। ২৭ মে উৎসবের পালে দে ফেস্টিভ্যালের গ্র্যান্ড থিয়েটার লুমিয়েরে সমাপন অনুষ্ঠানে জাস্টিন ত্রিয়েতের হাতে স্বর্ণপাম তুলে দেন আমেরিকান অভিনেত্রী জেন ফন্ডা। 'অ্যানাটমি অব অ্যা ফল' ছবির গল্পে দেখা যায়, তুষারপাতে স্বামীর মৃত্যুর পর খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন জার্মান লেখক সান্দ্রা। আদালতে বিচারকাজের সময় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন জাস্টিন ত্রিয়েত ও আর্থার হারারি। কানের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো কোনো নারী নির্মাতার সিনেমা এই স্বীকৃতি পেল। এর আগে নিউজিল্যান্ডের জেন ক্যাম্পিয়নের 'দ্য পিয়ানো' এবং জুলিয়া দুকুরনোর 'তিতান' স্বর্ণপাম জিতেছে। গ্রাঁ প্রি জিতেছে 'দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট' (জনাথন গ্লেজার, যুক্তরাজ্য), সেরা পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন ট্র্যান আন হাং (দ্য পত তাঁ ফু), সেরা অভিনেতা ফুজি ইয়াকুশো (পারফেক্ট ডেজ), সেরা অভিনেত্রী মারভে দিজদার (অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস), সেরা চিত্রনাট্যকার ইউজি সাকামাতো (মনস্টার)। স্বল্পদৈর্ঘ্য শাখায় সেরা হয়েছে 'টোয়েন্টিসেভেন' ফ্লোরা আন্না বুদা, ফ্রান্স ও হাঙ্গেরি)। আঁ সার্তে রিগা শাখায় সেরা সিনেমা হয়েছে 'হাউ টু হ্যাভ সেক্স' (মলি ম্যানিং ওয়াকার, যুক্তরাজ্য), জুরি প্রাইজ পেয়েছে মরক্কোর সিনেমা 'হাউন্ডস'। (সূত্র: ২৯ মে ২০২৩, সমকাল)

৭৬তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের বিজয়ীরা

শোক সংবাদ

আকবর হোসেন পাঠান ফারুক

বাংলা চলচ্চিত্রের নন্দিত নায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুক (৭৫) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। সিনেমাপাড়ায় তিনি 'মিয়া ভাই' নামে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ১৫ মে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার তুমালিয়া ইউনিয়নে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

চিত্রনায়ক ফারুকের লাশ সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১৬ মে ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে রাখা হয়।

রক্তে সংক্রমণজনিত জটিলতা নিয়ে দেড় বছরের বেশি সময় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ছিলেন ফারুক। সর্বশেষ ২০২১ সালের ৪ মার্চ নিয়মিত চেকআপের জন্য সিঙ্গাপুর যান তিনি। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ফারুক ১৯৭১ সালে 'জলছবি' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। তাঁর বিপরীতে নায়িকা হিসাবে কবরী অভিনয় করেন। এরপর তিনি ১৯৭৩ সালে 'আবার তোরা মানুষ হ' এবং ১৯৭৪ সালে 'আলোর মিছিল' নামে দুটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত 'সুজন সখী' ও 'লাঠিয়াল' দুটি ব্যাবসাসফল ও আলোচিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ফারুক। সে বছর 'লাঠিয়াল' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এরপর ১৯৭৬ সালে মুক্তি পায় তাঁর অভিনীত তিনটি চলচ্চিত্র–সূর্যগ্রহণ, মাটির মায়া ও নয়নমণি। চলচ্চিত্র তিনটি বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। পরের বছর 'সারেং বৌ' ও 'গোলাপী এখন ট্রেনে' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্র দুটি নারীকেন্দ্রিক হলেও ফারুকের অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৭৯ সালে তাঁর অভিনীত নাগরদোলা, দিন যায় কথা থাকে, কথা দিলাম, মাটির পুতুল, সাহেব, ছোট মা, এতিম, ঘরজামাই চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসাসফল হয়। ১৯৮০ সালে 'সখী তুমি কার' ছায়াছবিতে শাবানার বিপরীতে শহুরে ধনী যুবকের চরিত্রে অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে 'মিয়া ভাই' চলচ্চিত্রের সাফল্যের পর তিনি চলচ্চিত্রাঙ্গনে মিয়া ভাই হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

ফারুক স্কুলজীবন থেকে আওয়ামী ধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা আন্দোলনে যোগ দেন এবং এ সময়ে তাঁর নামে বহু মামলা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফারুক ২০১৮ সালে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসন (গুলশান-বনানী) থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

পিয়ারী বেগম

বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর অভিনেত্রী পিয়ারী বেগম (৮৭) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৩০ মে রাজধানীর উত্তরায় নিজের বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টর জামে মসজিদে জানাজা শেষে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টরে স্বামীর কবরের পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

পিয়ারী বেগমের স্বামী আমিনুল হকও অভিনেতা ছিলেন। 'মুখ ও মুখোশ' সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন পিয়ারী। আমিনুল হক ২০১১ সালে মারা যান। ইডেন কলেজে পড়া অবস্থায় ওই সিনেমায় অভিনয় করে অন্য কলাকুশলীদের সঙ্গে ইতিহাসে ঠাঁই করে নেন পিয়ারী।

আবদুল জব্বার খান পরিচালিত 'মুখ ও মুখোশ' সিনেমাটি ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট প্রথম প্রদর্শিত হয়। এর আগে ১৯৫৪ সালের ৬ আগস্ট হোটেল শাহবাগে সিনেমাটির মহরত অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে এ সিনেমার উদ্‌বোধন করেছিলেন। পিয়ারী বেগম ছাড়াও এ ছবিতে অভিনয় করেন পূর্ণিমা সেনগুপ্ত, ইনাম আহমেদ, সাইফুদ্দিন, বিনয় বিশ্বাস, জব্বার খান, জহরত আরা, রহিমা খাতুন প্রমুখ।

আজহার মাহমুদ

সিনিয়র সাংবাদিক ও বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজহার মাহমুদ (৫৩)

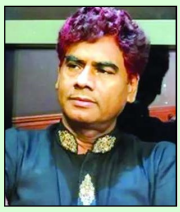

ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৪ মে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আজহার মাহমুদ সম্প্রতি লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

অনলাইন পোর্টাল ক্যাম্পাস লাইভের প্রধান সম্পাদক ছিলেন আজহার মাহমুদ। ভয়েস অব আমেরিকা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি। পরে দৈনিক বাংলাবাজার, মানবজমিন, বৈশাখী টেলিভিশন ও বিটিভিতে কাজ করেন এই সাংবাদিক।

রাত সাড়ে ৮টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) চত্বরে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

মাশুক উল হক

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য, প্রবীণ সাংবাদিক মাশুক উল হক (৭৮) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি রাজধানীর উত্তরার বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।

মাশুক উল হক ১৯৪৫ সালের ১ জানুয়ারি ফেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশবরেণ্য সাংবাদিক প্রয়াত ওবায়েদ উল হকের ছেলে। বাংলাদেশ অবজারভারের মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। সর্বশেষ ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের এডিটরিয়াল কনসালটেন্ট ছিলেন তিনি।

প্রজেশ চক্রবর্তী

চট্টগ্রামের ফটোসাংবাদিক প্রজেশ চক্রবর্তী (৪৮) ২ জুন পরলোকগমন করেন। হঠাৎ হৃদ্‌রোগ আক্রান্ত হলে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রজেশ চক্রবর্তীর শেষকৃত্যানুষ্ঠান রাতে নগরীর বলুয়ারদীঘিপাড়ে অভয়মিত্র মহাশ্মশানে সম্পন্ন হয়।

গোলাম রাব্বানী নাদিম

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় হামলা চালিয়ে সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিমকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ১৪ জুন রাত ১০টার দিকে বকশীগঞ্জ পৌর টিঅ্যান্ডটি রোডে পাটহাটি মোড়ে সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত হন নাদিম। ১৫ জুন বিকাল পৌনে ৩টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

গোলাম রাব্বানী নাদিম বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর ডটকমের জামালপুর জেলা প্রতিনিধি এবং ৭১ টিভির বকশীগঞ্জ উপজেলার সংবাদ সংগ্রাহক। তিনি বকশীগঞ্জ কাছারিপাড়া এলাকার অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য আব্দুল করিমের ছেলে।

আহমেদ ইউসুফ সাবের

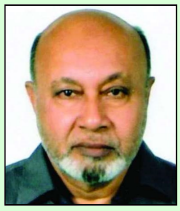

নাট্যকার ও পরিচালক, প্রখ্যাত গীতিকবি, বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা আহমেদ ইউসুফ সাবের ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৫ জুন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে হার্ট অ্যাটাক হলে তাঁকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আহমেদ ইউসুফ সাবের বেশকিছু জনপ্রিয় গানের গীতিকবি। তাঁর লেখা গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'যখনই নিবিড় করে', 'সুখী মানুষের ভিড়ে', 'মায়াবী এ রাতে', 'এক নয়নে হয় না কান্দন', 'বিদ্রোহী প্রভৃতি। আহমেদ ইউসুফ সাবের অসংখ্য বিজ্ঞাপনচিত্রের জিঙ্গেলও লিখেছেন। বিজ্ঞাপনচিত্র পরিচালনায়ও দেখা গেছে তাঁকে। রচনা ও পরিচালনা করেছেন বেশকিছু টিভি নাটক। এছাড়া চলচ্চিত্রের কাহিনি এবং চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। পাশাপাশি সাহিত্যের আরও নানা ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিচরণ।

শাহানারা বেগম

যশোরের জ্যেষ্ঠ নারী সাংবাদিক এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের স্টাফ রিপোর্টার শাহানারা বেগম (৬৬) ২৬ মার্চ যশোর শহরের সার্কিট পাড়ার নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি বার্ধক্যজনিতসহ নানা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। কারবালা মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজ শেষে কারবালা কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আমিনুর রহমান সরকার

দৈনিক দিনকালের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আমিনুর রহমান সরকার ২৭ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে চারদিন আগে ৭২ বছর বয়সি আমিনুর রহমানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য আমিনুর রহমান ১৯৫১ সালের ১১ অক্টোবর গাইবান্ধার ভরতখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাদ জোহর জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে তাঁর লাশ গ্রামে নেওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সৈয়দ মনিরুল আলম গাজী

গাজীপুর প্রেস ক্লাবের সদস্য ও সময় টেলিভিশনের সাবেক গাজীপুর প্রতিনিধি সৈয়দ মনিরুল আলম গাজী (৬০) ২২ জুন ঢাকার উত্তরার বাসভবনে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরায় প্রথম এবং গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুরে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

কুদরত ই খুদা

রাজধানীর কলাবাগান থানার লেক সার্কাস রোডের একটি বাসা থেকে কুদরত ই খুদা ওরফে হৃদয় নামের এক সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ৯ মে লেক সার্কাস রোডের একটি ভবনের চিলেকোঠা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই হৃদয়ের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে ফেলা হয়।

কুদরত ই খোদা বেসরকারি যমুনা টেলিভিশনের নিউজ রুম এডিটর (ডিজিটাল) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কলাবাগানের লেক সার্কাসের একটি বাসার অষ্টম তলায় থাকতেন তিনি। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদরের হোসেনপুর উত্তর ধানবান্দি গ্রামে। তাঁর বাবা আরিফ আহমেদ মিঠু ইতালিপ্রবাসী।

অ্যাঞ্জেলা থর্ন

ব্রিটিশ অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা থর্ন (৮৪) আর নেই। ১৬ জুন নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তিনি ব্রিটিশ অভিনেতা রুপার্ট এবং লরেন্স পেনরি জোনসের মা। তাঁর স্বামী অভিনেতা পেনরি জোনস। 'টু দ্য ম্যানোর বর্ন' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবর বলছে, ১৯৭৯ সালে মাইকেল এলফিকের বিপরীতে বিবিসি কমেডি থ্রি আপ, টু ডাউনে অভিনয় করেছিলেন এ অভিনেত্রী। তিনি গিল্ডহল স্কুল অব মিউজিক অ্যান্ড ড্রামায় স্কলারশিপ নিয়ে প্রশিক্ষণ নেন এবং পরে রেপার্টরি মৌসুমে অভিনয় করেন।

মার্কো অরেলিও রামিরেজ

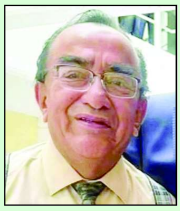

মেক্সিকোতে দুর্বৃত্তের গুলিতে ২৩ মে এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মার্কো অরেলিও রামিরেজ (৬৯)। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রামিরেজ তেহুয়াকান শহরে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় প্রকাশ্যে হামলার শিকার হন। তিনি কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন।

সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের (আরএসএফ) মেক্সিকো শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রামিরেজ সন্দেহভাজন কয়েকজন অপরাধীকে ধরতে অবদান রেখেছিলেন। আরএসএফ এ ঘটনায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানিয়ে বলেছে, 'হত্যাকাণ্ডটির সঙ্গে রামিরেজের স্থানীয় মিউনিসিপ্যালের কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কাজের কিংবা সাংবাদিকতার অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। আরএসএফের মতে, ২০০০ সাল থেকে মেক্সিকোতে ১৫০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হন।

পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় Internet of Things (IoT) বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

দক্ষ জনশক্তিই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনবে

দক্ষ জনশক্তিই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। পিআইবির কর্মকর্তাদের নিয়ে পিআইবি সেমিনার কক্ষে ১৮ মে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় Internet of Things (IoT)-এর করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। জাফর ওয়াজেদ বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে না পারলে আগামী দিনে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দুরূহ হয়ে পড়বে। পিআইবি মহাপরিচালক আরও বলেন, রোবোটিক্স, আইওটি ও ন্যানো প্রযুক্তি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে অনেক বেশি সম্মোহনী করে তুলছে। তাই এ প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদেরও দক্ষ করে তুলতে হবে। অন্যথায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে যাবে। জাফর ওয়াজেদ বলেন, এ বিপ্লবের কারণে সবকিছু গাণিতিক হারে পরিবর্তন হচ্ছে, যা আগে কখনো হয়নি। কর্মশালায় এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-এর সহকারী প্রোগ্রামার মো. রিয়াজুল ইসলাম Internet of Things (IoT)-এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ই-নথি ও ডি-নথি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের ধারণা দেন। ব্লকচেইন প্রযুক্তি, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, উন্নত মানের জিন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন মো. রিয়াজুল ইসলাম। পিআইবির পরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেনের সমন্বয়ে পিআইবির ১৫ জন কমকর্তা-কর্মচারী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় পিআইবির গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. কামরুল হক উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

প্রযুক্তি বিকাশে বেড়েছে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ

প্রযুক্তির বিবর্তনে সাংবাদিকতায় নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সাংবাদিকতা প্রথাগত নিয়মের বেড়াজাল ছিন্ন করে নতুন ধাঁচে অগ্রসরমান। এই নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। ইন্টারনেটের যুগে সাংবাদিকরা যাচাই-বাছাই ছাড়া সংবাদ পাঠকের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। এতে অনেক সময় ভুল সংবাদের জন্য পাঠক বিভ্রান্ত হচ্ছে। এজন্য সব চাপ ও বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে পাঠককে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা একজন দক্ষ ও মানসম্পন্ন সাংবাদিকের কাজ। সাংবাদিকতাকে ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের আয়ত্তে রাখতে হলে প্রযুক্তি বিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে, নতুবা চ্যালেঞ্জে হারিয়ে যাবে। প্রাচীনকালে সমাজের ওয়াচম্যান থেকে সাংবাদিকতার ধারণা প্রচলিত। এরপর সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টেলিভিশনের পর এসেছে অনলাইন। এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজেদের উপযোগী করে তুলতে না পারলে সাংবাদিকতায় টিকে থাকা দায় হয়ে যাবে।

'বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে ৩ জুন আলোচকরা এসব কথা বলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের আয়োজনে পিআইবি সেমিনার কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে এবং অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রভাষক ও সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী শুভ কর্মকারের সমন্বয়ে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এআই-এর সঙ্গে সাংবাদিকতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রযুক্তিজ্ঞান আহরণের বিকল্প নেই। ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমলের সাংবাদিকতা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সাংবাদিকতা সাথে বর্তমান ডিজিটাল সাংবাদিকতার বিস্তর ফারাক রয়েছে। সেকেলে সাংবাদিকতাকে আঁকড়ে আনলে অদূর ভবিষ্যতে পেশার সঙ্গে নিজেকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। প্রযুক্তিজ্ঞানের দাপটে নিজেদের আর খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। সাংবাদিকদের প্রযুক্তি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে বলেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের ইতিহাস অনেক পুরোনো। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু হলেও এখনো টিকে আছে। টেলিভিশন ও বেতারের তুলনায় সংবাদপত্র অনেক প্রাচীন। তিনি বলেন, বিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেটের আবির্ভাবে মানুষের কাছে সহজে তথ্য পৌঁছে যাওয়ায় সংবাদপত্র, রেডিয়ো ও টেলিভিশন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সেমিনারে পিআইবির পরিচালক প্রশাসন মো. জাকির হোসেন অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাংবাদিকতাকে সময়ের তাগিদে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানোর কথা বলেন। সাংবাদিকতাকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের পর এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব চলে এসেছে। এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর আগেই পঞ্চম শিল্পবিপ্লব চলে আসবে। তাই সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাংবাদিককে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) শেখ মজলিশ ফুয়াদ সংবাদপত্রের সত্তর ও নব্বইয়ের দশকের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি তুলনা করে সাংবাদিকদের যোগ্য করে গড়ে তোলার কথা বলেন। সাংবাদিকতায় দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সমাজের কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পংকজ কর্মকার। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার ধারা পালটে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সংকট দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে উত্তরণের জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রভাষক লাজিনা আক্তার জ্যাসলিন ও পিআইবির সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে ১৯ মার্চ পিআইবির সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের আলোকে 'বঙ্গবন্ধুর মানস' শীর্ষক প্রবন্ধলিখন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে এবং পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুঘটক তথ্যের অবাধ প্রবাহ

সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুঘটক হিসাবে কাজ করে তথ্যের অবাধ প্রবাহ। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজটি করে থাকেন সংবাদকর্মীরা। উন্নত রাষ্ট্র গঠন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই গণমাধ্যমের সৃষ্টি

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল গণমাধ্যম। গণমাধ্যম সমাজের দর্পণস্বরূপ। ঠিক তেমনইভাবে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা ফুটে ওঠে। ১৪ জুন 'সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অবহিতকরণ' শীর্ষক কর্মশালায় আলোচকরা এসব কথা বলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সঞ্চালক ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এবং পরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন। সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন র‍্যাপোর্টিয়ার হিসাবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সুশাসন এখন সারা পৃথিবীতে কাঙ্ক্ষিত শব্দ। সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। সেসব কাজের মধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, এনআইএস, জিআরএস, তথ্য অধিকার এবং এপিএ। সমাজের অনাচার তুলে ধরতে এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দেন তিনি। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকদের চিন্তার দিগন্ত উন্মোচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালার প্রধান আলোচক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রেস) মো. নজরুল ইসলাম সুশাসন নিশ্চিতে সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। এগুলোর মাধ্যমে একদিকে জবাবদিহি নিশ্চিত হয়, অপরদিকে ফলাফলনির্ভর কাজ সম্ভব হয়। সমাজে প্রতিটি স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকবান্ধব ছিলেন। এমনকি প্রজাতন্ত্রের সব কর্মচারীকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, সুশাসনের সঙ্গে দুর্নীতির একটা সম্পর্ক রয়েছে। সুশাসন থাকলে দুর্নীতি কমে যায়। তাই সুশাসন বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি সাংবাদিকদেরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এটিএন নিউজের প্রধান প্রতিবেদক আরাফাত সিদ্দিকী। তিনি সাংবাদিকতার ধারা ও সংবাদ পরিবেশনে বিভিন্ন বাধার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন অনুসন্ধানী ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজে দুর্নীতি কমিয়ে সুশাসনের রুদ্ধ পথ খুলে দেওয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত রাবেয়া বেবী সমাজে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কেবল টিভিসহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এই মাধ্যমগুলো অনেক সময় সমাজে বিভিন্ন দুর্নীতি করতে সহায়তা করে।

আলোচনায় অংশ নেওয়া জাগো নিউজের সহ-সম্পাদক আরাফাত সিদ্দিকী বলেন, শাসন ও সুশাসন ব্যাপারটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম। একজন গণমাধ্যমকর্মীর ভূমিকায় রাষ্ট্রের অনেক কিছু পরিবর্তন, সংশোধন হতে পারে। তাই সরকারের সহযোগিতামূলক প্রতিবেদন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকায় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন পিআইবির তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারী পেলেন শুদ্ধাচার

পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

পুরস্কার। ২১ জুন দুপুরে পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এ পুরস্কার তুলে দেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-৯ ক্যাটাগরিতে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রভাষক শুভ কর্মকার, গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-১৬ ক্যাটাগরিতে হিসাবরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. আলী হোসেন, গ্রেড-১৭ থেকে গ্রেড-২০ ক্যাটাগরিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো. ইছাক মিয়া এ পুরস্কার পান। পুরস্কারপ্রাপ্তরা সনদপত্র, ক্রেস্ট ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পেয়েছেন।

এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮ সালের ২৮ মার্চের পরিপত্র অনুসারে শ্রমসাধ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য পিআইবির ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানি দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, পরিচালক অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ, পরিচালক গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. কামরুল হকসহ পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

পিআইবি'র ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ক্রয় পদ্ধতি বিষয়ে ৫ জুন প্রশিক্ষণে পিআইবি সেমিনার কক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র পরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন

কম্পিউটার অপারেটর ফাতেমা বেগমকে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের চেক প্রদান করছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

অফিস সহায়ক মো. মিজানুর রহমানকে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের চেক প্রদান করছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ